'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' পঞ্চম সংখ্যা

ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড

বিজ্ঞান-ভিক্ষু

বেঙ্গল মাস্ এডুকেশন সোসাইটী
৯৯।১এফ্ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার,
কলিকাতা

মূল্য বার আনা

প্রকাশক :
শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, এম্‌. এস্‌-সি
৯১।১এফ্‌ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার,
কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীসত্যচরণ বসু
বোস প্রেস
৩০নং ব্রজ মিত্র লেন, কলিকাতা

ভূমিকা

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পুস্তকমালার পঞ্চম পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল। স্যর জেম্‌স্ জীন্‌সের এ-বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধগুলির অনুকরণে এই পুস্তকখানি লেখা। তাঁহার অপরিশোধ্য ঋণ কৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করিতেছি।

পূর্ব্বের ন্যায় এই পুস্তকেরও ভাষা ও আগাগোড়া প্রুফ্ আমার বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় এম. এ. মহাশয় দেখিয়া দিয়া আমায় চিরঋণী করিয়াছেন। তাঁহার উৎসাহ ভিন্ন এ পুস্তকমালা এত শীঘ্র এতদূর অগ্রসর হইতে পারিত না।

এই পুস্তকমালার পূর্ব্বে প্রকাশিত পুস্তকগুলির ন্যায় এইটির চিত্রও স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ কৃষ্ণলাল রায়চৌধুরী আঁকিয়াছেন।

বাংলা ভাষায় সাধারণের বোধগম্য করিয়া বিজ্ঞানের মূল বিষয়গুলি লিখিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা একেবারে নূতন বলিলেই হয়। আশা করি সুধীসমাজ এই পুস্তকমালার গ্রাহক হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। ইতি—

একাদশী,
৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮

গ্রন্থকার

সূচী

ভেবেছিনু গণি গণি লবো সব তারা,
গণিতে গণিতে রাত হয়ে যায় সারা,
বাছিতে বাছিতে কিছু না পাইনু বেছে।
আজ বুঝিলাম, যদি না চাহিয়া চাই
তবেই তো এক সাথে সব কিছু পাই,
সিন্ধুরে তাকায়ে দেখো, মরিও না সেঁচে

রবীন্দ্র নাথ।

সৌরশিখা

সূর্য্যের পূর্ণগ্রাসের সময় যে ফটো লওয়া হয় এই ছবিখানি তাহারই নকল। ছবির বামপার্শ্বের উপরে পিপীলিকা ভূকের আকারে একটি সৌরশিখা দেখা যাইতেছে। সৌর অগ্নিকুণ্ড হইতে সূর্য্যের লেলিহান বিশাল জিহ্বা এইরূপভাবে নিত্যই লক্ষ লক্ষ মাইল ব্যাপী মহাকাশ স্পর্শ করে ।

ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড

১

পৃথিবী-সূর্য্য-চন্দ্র

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল স্বচ্ছ। ফলে মহাকাশে যে বিরাট চন্দ্রাতপ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহার তুলনা নাই। এ সৌভাগ্য সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহবাসীর পক্ষে সম্ভব হয় নাই। শুক্র বা বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল এত ঘন বাষ্পপূর্ণ যে তদ্দেশবাসীদিগের মহাকাশের অপূর্ব্ব রূপ দেখিবার সৌভাগ্য ঘটে না। আমাদের পৃথিবীও একদিন ঐরূপ ঘন কুয়াসার অন্ধকারে ডুবিয়া থাকিত।

পৃথিবীর আবর্ত্তন—দিন ও রাত্রি

তাহার পর পৃথিবীর ঘন অন্ধকারময় বায়ুমণ্ডল স্বচ্ছ হইয়া আসিল। তখন সূর্য্যই জীবকুলের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সূর্য্যের আলোকে আলোকিত খণ্ডকাল দিন নামে পরিচিত হইতে লাগিল এবং উহার অভাবে অন্ধকারময় খণ্ডকাল রাত্রি আখ্যা লাভ করিল।

প্রথমে মানুষ ঠিক ধরিতে পারে নাই কেন এরূপভাবে পৃথিবী একবার সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোকে হাসিতে থাকে, আবার কিছুক্ষণ পরেই ঘন অন্ধকারে ডুবিয়া যায়। ক্রমশঃ মানুষ আবিষ্কার করিল সূর্য্য আকাশে উঠে না বা ডোবে না; পৃথিবী লাট্টুর মত অবিরাম পাক খাইতেছে, সেইজন্য উহার প্রতি অংশ পর্য্যায়ক্রমে আলোক বা অন্ধকার ভোগ করে।

পৃথিবীর সূর্য্য প্রদক্ষিণ—ঋতু সৃষ্টি

ক্রমশঃ মানুষ দেখিল যে তাহার দিবা বা রাত্রির ভোগ কাল ঠিক সমান নহে। তাহার পর কখন সে শীতে কষ্ট পায়, কখন সূর্য্যের প্রখর তাপ তাহাকে ক্লিষ্ট করে। কখন সে দেখে বৃষ্টি-ধারায় স্নান করিয়া ধরার শস্যশ্যামলরূপ; আবার কখন দেখে রৌদ্রদগ্ধ ধরাপৃষ্ঠ তপ্ত ধূলি ধূসরিত। এ "কেন"র উত্তরই
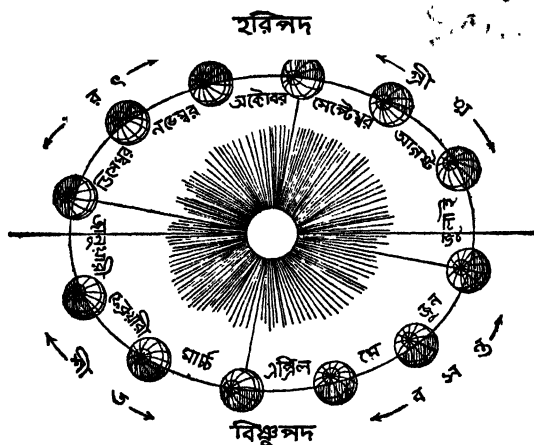
অনুসন্ধান করিতে গিয়া মানুষ আবিষ্কার করিল যে ধরাপৃষ্ঠের এইরূপ রূপ-পরিবর্ত্তন একটা নিয়মিত ক্রম অনুসরণ করিয়া পুনরায় দেখা দেয়। এই যে একই প্রকার আবহাওয়ার পুনরাবৃত্তি নিয়মিত চক্রাকারে আনাগোনা করে, ইহার কারণ খুঁজিতে গিয়া বহু চিন্তার পর সে আবিষ্কার করিল যে পৃথিবী একটা নিয়মের বশে সূর্য্যকে অবিরাম প্রদক্ষিণ করিতেছে।

চন্দ্রের পৃথিবী প্রদক্ষিণ

মানুষ চিন্তা করিবার অধিকার পাওয়ায় তাহার চিন্তার শেষ নাই। সে দেখিল রাত্রের অন্ধকারের নিয়মিত হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। সূর্য্যেরই মত চন্দ্র নিয়মিত

আকাশে আনাগোনা করে। আবার সমস্যা দেখা দিল। এ সমস্যার সমাধানও কালে মিলিল। সে দেখিল পৃথিবী যেরূপ সূর্য্যকে অবিরাম প্রদক্ষিণ করিতেছে, চন্দ্রও ঠিক সেইরূপ পৃথিবীকে অবিরাম প্রদক্ষিণ করিতেছে।

চন্দ্রের তিথি

চন্দ্রের উদয়াস্তে একটা বিশেষত্ব দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পূর্ণাঙ্গ সূর্য্য আকাশে ধীরে ধীরে অর্দ্ধচক্রাকারে পরিভ্রমণ করিয়া দিক্‌চক্রবালে আত্মগোপন করে। কিন্তু চন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ হইতে প্রায় ১৫ দিন সময় লাগে। ফালি ফালি
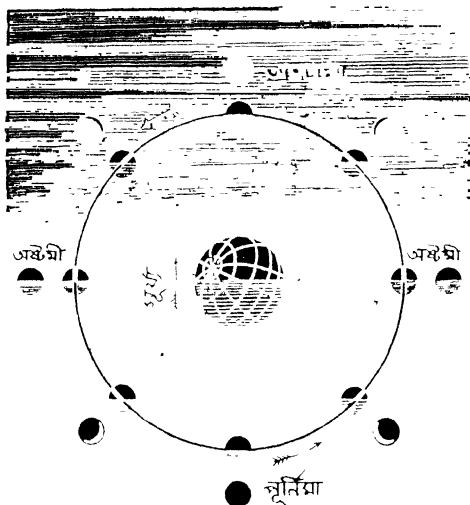
করিয়া দিনে দিনে চন্দ্রের আকার বাড়িতে বাড়তে প্রায় ১৫ দিনে উহার পূর্ণাঙ্গ আকার দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্রের আকার-বৃদ্ধির সহিত উহার ভোগকালও বাড়িতে থাকে। পূর্ণাঙ্গ চন্দ্র সারারাত্রি আকাশে আলো দেয়। এই পূর্ণাঙ্গ চন্দ্রের দিনকে পূর্ণিমা বলে।

পূর্ণাঙ্গ লাভ করিবার পর আবার ধীরে ধীরে ফালি ফালি করিয়া চন্দ্রের আকার কমিতে থাকে। আকার কমিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার আকাশে থাকিবার কালও কম হইতে থাকে। তাহার পর ক্রমশঃ একদিন উহাকে আর দেখা যায় না। এই সম্পূর্ণ না দেখিতে পাওয়ার দিনকে অমাবস্যা বলে।

সূর্য্যও অস্থির
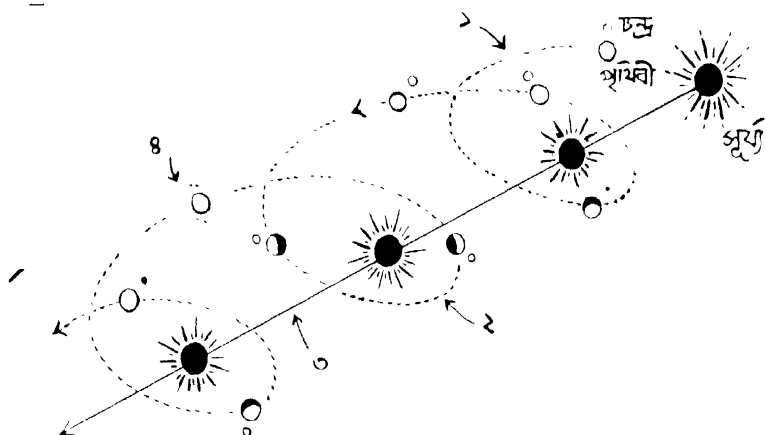
সূর্য্যের গতিপথ

ক্রমশঃ মানুষের পর্য্যবেক্ষণ শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় সে লক্ষ্য করিল সূর্য্যও স্থির নাই। সেও মহাকাশে সপরিষদ্ অবিরাম ছুটিতেছে। কোথায়? কে জানে—

সূর্য্যলোক—দূর হইতে

সৌরমণ্ডল

বৈশ্বানরের লীলাক্ষেত্র সূর্য্য একটা বিরাট অগ্নিগোলক। আমাদের পৃথিবী ও চন্দ্রের তুলনায় বিরাট হইলেও সূর্য্য কিন্তু অন্যান্য তারার তুলনায় অসাধারণ মোটেই নয়। সূর্য্যকে কেন্দ্রে রাখিয়া আমাদের পৃথিবীর মত যে সকল জগত নিয়ত ঘুরিতেছে, সেগুলিকে গ্রহ বলে। আমাদের পৃথিবীও একটি গ্রহ। আবার কোন গ্রহকে কেন্দ্রে রাখিয়া যে সকল পৃথিবী নিয়ত প্রদক্ষিণ করে, তাহাদিগকে উপগ্রহ বলে। চন্দ্র আমাদের পৃথিবীর একটি উপগ্রহ বিশেষ। এই সকল গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি লইয়া সৌরমণ্ডল গঠিত। সৌরমণ্ডলের সূর্য্যই স্রষ্টা ও প্রাণ। সূর্য্যই প্রত্যেক গ্রহ উপগ্রহাদির গতি ও বেগের নিয়ন্তা। আমাদের স্থূল চক্ষে যে বিশ্বের অনুভূতি ঘটে, তাহার মধ্যে সূর্য্য একটা অপরিমেয় শক্তির বিরাট বিকাশ মাত্র।

দূরত্ব

আমাদের পৃথিবী হইতে সূর্য্য প্রায় ৯২,৯০০,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। কোন ট্রেণ ঘণ্টায় ৬০ মাইল ছুটিলে পৃথিবী হইতে সূর্য্যে পৌছিতে তাহার ১৭৫ বৎসর লাগিবে। ৩০০ মাইল বেগে বিমান (Aeroplane) ছুটিলে উহা সূর্য্যে ৩৫ বৎসরে গিয়া পৌছিবে।

সূর্য্যের ব্যাস ৮৬৬,৫০০ মাইল, প্রায় পৃথিবীর ব্যাসের ১০৯½ গুণ। সূর্য্যের তাপ এত বেশী যে তথায় সকল পদার্থই বাষ্পীভূত হইয়া আছে; সেইজন্য মনে হয় সূর্য্যের ব্যাসের পরিমাণে দুই চারিশত মাইল ভুল থাকা সম্ভব। সূর্য্যের কালি (area) পৃথিবীর কালির ১২০০ গুণ এবং সূর্য্যের মধ্যে আমাদের পৃথিবীর মত ১৩০০,০০০টি পৃথিবী পুরিয়া রাখা যায়।

জ্যোতির্মণ্ডল (Photosphere)

সূর্য্যের উপরের যে অংশটুকু আমাদের চোখে পড়ে, তাহাকে জ্যোতির্মণ্ডল (Photosphere) বলে। খুব ভাল করিয়া দূরবীক্ষণ সাহায্যে দেখিলে মনে হয় ইহা মোটেই মসৃণ নহে, বরং অনেকটা খস্‌খসে ড্রইং কাগজের মত। জ্যোতির্মণ্ডলের ধারগুলির তুলনায় কেন্দ্র খুব বেশী জ্যোতির্ম্ময়। আধুনিক মতে মনে হয় জ্যোতির্মণ্ডল সূর্য্যের উপর ভাসমান মেঘের চাঁদোয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের পৃথিবীতে যেমন জল বাষ্পাকারে উপরে উঠিয়া অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ুর
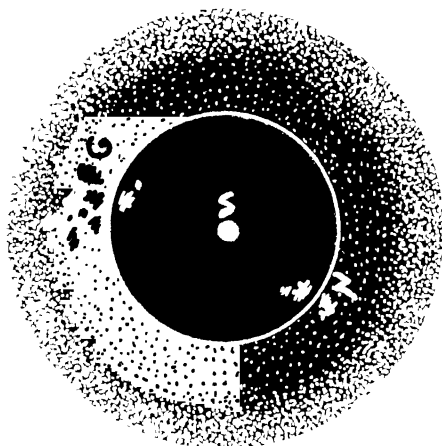
(১) পৃথিবী, (২) চন্দ্রের কক্ষ, (৩) সৌরকলঙ্ক

এই আনুপাতিক চিত্র হইতে সূর্য্যের বিশালতার ধারণা জন্মিবে।

সংস্পর্শে আসায় জমিয়া মেঘে পরিণত হইয়া বায়ুমণ্ডলে ভাসিতে থাকে, ঠিক সেইরূপ সৌরলোকের অত্যধিক তাপে সকল পদার্থই বাষ্পীভূত হইয়া উপরে উঠিয়া অপেক্ষাকৃত শীতল সৌরাকাশের সংস্পর্শে আসায় উহা জমিয়া মেঘের মত সৌরলোকের বায়ুমণ্ডলে ভাসিতে থাকে। এই ভাসমান মেঘের আবরণের নাম

জ্যোতির্মণ্ডল। সৌরলোকের বায়ুমণ্ডল নানাবিধ ধাতু প্রভৃতির বাষ্পে গঠিত। সৌরলোকের বায়ুমণ্ডলের অপেক্ষা জ্যোতির্মণ্ডল ঘন বলিয়া তাহাতে সূর্য্যের অগ্নিশিখা পড়িয়া উহাকে অতিশয় জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলে।

সৌরকলঙ্ক (Sunspots)

মাঝে মাঝে সূর্য্যের গায়ে কালো কালো দাগ দেখিতে পাওয়া যায়; এগুলি স্থূলচক্ষে মোটেই ধরা পড়ে না, খুব যত্ন করিয়া সৌরবীক্ষণ (Helioscope) সাহায্যে দেখিলে তবে তাহাদের গতিবিধি, প্রকৃতি, পরিণতি ইত্যাদি বুঝিতে পারা যায়। এই কালো দাগগুলিকে সৌরকলঙ্ক (sunspots) বলে। সৌর-কলঙ্কের মাঝখানটি বড়ই কালো দেখায়; তাহার কারণ যে সূর্য্যের সেই স্থান হইতে আলো বা তাপ কিছুই আসে না তাহা নয়। জ্যোতির্মণ্ডলের জ্যোতির শতাংশের একাংশ জ্যোতিঃ সৌরকলঙ্ক হইতে পাওয়া যায়, তাই অপেক্ষাকৃত অত্যধিক জ্যোতির তুলনায় উহাকে কালো দেখায়। তাহা হইলেও আমাদের সৃষ্ট আলো বা তাপ অপেক্ষা সৌরকলঙ্ক হইতে সহস্র গুণ অধিক তাপ বা আলো আমরা পাইয়া থাকি।

বর্ণমণ্ডল (Chromosphere) ও সৌর শিখা (Prominences)

জ্যোতির্মণ্ডলের উপরে একখানি পাতলা লাল রংএর চাদর দিয়া ঢাকা। সূর্য্য বহুদূরে অবস্থিত বলিয়া রক্তবর্ণ চাদরখানি পাতলা দেখায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। সূর্য্যগ্রহণের পূর্ণগ্রাসের সময় সৌরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে মনে হয় যেন সূর্য্যে আগুন লাগিয়াছে। চন্দ্র যখন সূর্য্যকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া ফেলে, তখন চন্দ্রমণ্ডলের চারিদিকে অগ্নিশিখার মত অনেকগুলি রক্তবর্ণ শিখা দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলিকে সৌরশিখা বলে।

সৌরপ্রভা (Corona)

এই পূর্ণগ্রাসের সময় আর একটি অতি অদ্ভুত দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। সূর্য্য সম্পূর্ণরূপ ঢাকা পড়িবার পর যখন চারিদিকে কেবলমাত্র অন্ধকার, তখন

সূর্য্যের চারিদিকে একটা অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় জ্যোতির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে সৌরপ্রভা বলে। পূর্ণিমা তিথিতে আমাদের চাঁদ যে স্নিগ্ধ আলোটুকু ছড়াইয়া থাকে, তাহার অন্ততঃ দুই তিন গুণ আলো সৌরপ্রভা দেয়,

সৌরপ্রভা

কিন্তু বহুদূরে থাকায় তাহার সৌন্দর্য্য ক্ষীণভাবে চোখে ধরা পড়ে। মনে হয় সৌরপ্রভা সূর্য্যের বৈদ্যুতিক শক্তির ক্ষীণ বিকাশ মাত্র। আমাদের মেরু প্রদেশ যেমন মাঝে মাঝে এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে আলোকিত হইয়া উঠে, সেইরূপ বোধ হয় কোন বৈদ্যুতিক কারণে সৌরপ্রভার সৃষ্টি।

সূর্য্যের তাপের উৎস

বহু ঘটনা হইতে মনে হয় যে, সূর্য্য এত গরম যে কোন পদার্থ বাষ্পীভূত অবস্থা ছাড়া আর কোন অবস্থায় তথায় থাকিতে পারে না। সর্ব্বদা সূর্য্য যে এত তাপ বিকীরণ করে, সে এত তাপ কোথায় পায়? অনেকে অনেক কথা বলেন। জর্ম্মান পণ্ডিত হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জের মতে সূর্য্য নিজের মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে ক্রমাগত

অল্প অল্প করিয়া ঘনীভূত হইতেছে, সূর্য্যের এই ঘনীভূতির চাপের ফলে যে তাপ পাওয়া যায় তাহাই সে আকাশে ছড়াইয়া থাকে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে এক বৎসরে সূর্য্যের ব্যাস যদি ২০০ ফুট ঘনীভূত হয়, তাহাতে যে পরিমাণ তাপ পাওয়া যায়, তাহাই সূর্য্যের এক বৎসরের বর্ত্তমান পরিমাণে তাপ বিকীরণের সমান।

সূর্য্যেরও পৃথিবীর মত আহ্নিক আবর্ত্তন আছে। আমাদের প্রায় ২৭ দিনে সূর্য্যের একটী সম্পূর্ণ আবর্ত্তন ঘটে। সূর্য্যে যদি পৃথিবীর মত দিন থাকে, তাহা হইলে এখানকার মত ২৪ ঘণ্টায় দিন না হইয়া ২৪×২৭=৬৪৮ ঘণ্টায় দিন হয়।

৩

চন্দ্রলোক

চন্দ্রের আলোক

সূর্য্যের পরেই চন্দ্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আকাশে চাঁদ প্রায় একখানি রূপার থালার মত দেখিতে। তাহার জ্যোতিও বেশ স্নিগ্ধ, সূর্য্যের মত তীব্র মোটেই নয়। চাঁদের নিজের কিরণ দিবার ক্ষমতা নাই, সূর্য্যের কিরণ তাহার উপর পড়িয়া প্রতিফলিত হইয়া আমাদের নিকট আসে বলিয়া সূর্য্যের আলোর প্রখরতাটুকু আর তাহাতে থাকে না।

দূরত্ব

চন্দ্র আমাদের পৃথিবী হইতে প্রায় ২০৮,৮৪০ মাইল দূরে অবস্থিত। চন্দ্রের কক্ষ (orbit) গোলাকার নয়, ডিম্বাকার; সেইজন্য পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব কখনও কমে, কখনও বা বাড়ে। পৃথিবী প্রদক্ষিণ কালে চন্দ্র প্রতি সেকেণ্ডে ৩৩৫০

ফুট বা ঘণ্টায় ২২৭৮ মাইল বেগে ছুটে। চন্দ্রও পৃথিবীর মত আবর্ত্তন ও প্রদক্ষিণ গতি বিশিষ্ট। তবে চন্দ্রের একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে যতদিন লাগে, ঠিক ততদিনই উহার একবার সম্পূর্ণ পাক খাইতে লাগে।

চন্দ্রলোকে দিন ও রাত্রি

চন্দ্রের একবার সম্পূর্ণ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে প্রায় ৩০ দিন, ঠিক ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট ৩ সেঃ (প্রায়) সময় লাগে। তাহার একবার সম্পূর্ণ পাক খাইতেও প্রায় ৩০ দিন সময় লাগে, সেইজন্য চন্দ্রলোকে বেলা (সূর্য্যালোক ভোগ সময়) আমাদের বেলার মত ১২ ঘণ্টায় শেষ হয় না। সেখানে বেলা প্রায় আমাদের পৃথিবীর হিসাব অনুসারে ১৫ দিন থাকে, আর রাত্রিও ১৫ দিন ভোগ হয়। সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ ও আবর্ত্তনের সময় এক হওয়ায় মানব চিরকালই চন্দ্রের একই পৃষ্ঠ দেখিয়া আসিতেছে; অপর গোলার্দ্ধ কখনও তাহার দৃষ্টিতে পড়ে না।

চন্দ্রের তিথি

চন্দ্রের নিজের আলো দিবার ক্ষমতা নাই, সূর্য্যের আলো তাহার পৃষ্ঠে ঠেকিয়া আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিলে আমরা চন্দ্র দেখিতে পাই, আর অন্য সময় পাই না। চন্দ্রপৃষ্ঠের সকল অংশ হইতে প্রতিফলিত সকল আলোটুকু সকল দিনই আমাদের চোখে পড়ে না। যেদিন যতখানি চন্দ্র পৃষ্ঠের আলো আমাদের চোখে পড়ে ততখানি চন্দ্রলোকের অংশ আমরা সেদিন দেখিতে পাই। এইরূপ আংশিক চন্দ্র দর্শনে পক্ষ ও তিথির উৎপত্তি। যে দিন চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবীর মাঝখানে আসে, সেদিন তাহার আলোকিত পৃষ্ঠ আমাদের নয়নগোচর হয় না বলিয়া সেদিনকে আমরা অমাবস্যা তিথি বলিয়া থাকি।

তাহার পর দিন আলোকিত চন্দ্রপৃষ্ঠের অতি সামান্য অংশ পৃথিবী হইতে দেখা যায়, সে দিন প্রতিপদ তিথি; আলোকিত অংশ অতি সামান্য বলিয়া এ দিনের চাঁদ প্রায় দেখা যায় না। তাহার পর দিন দ্বিতীয়া, সে দিন আলোকিত চন্দ্রপৃষ্ঠের আরও একটু বেশী অংশ আমাদের চোখে পড়ে; চন্দ্রের আবর্ত্তন-কালে

তাহা শীঘ্রই লুকাইয়া পড়ে। এইরূপে দিনের পর দিন, ১৫ দিন ধরিয়া তৃতীয়া, চতুর্থী.........ইত্যাদি ১৫টি তিথিতে আলোকিত চন্দ্রপৃষ্ঠের অংশ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভোগকালও বাড়িতে থাকে। তাহার পর ১৫ দিনের দিন আলোকিত সম্পূর্ণ চন্দ্র-গোলার্দ্ধ আমরা দেখিতে পাই। সেই দিনকে

(১) এক ফালি চাঁদ, উহার উপরে চাঁদের অদৃশ্য অংশ
(২) দিক্‌চক্রবাল (৩) অস্তগত সূর্য্য

আমরা পূর্ণিমা তিথি বলিয়া থাকি। এই দিন চন্দ্র ও সূর্য্যের মাঝখানে পৃথিবী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই ক্রমশঃ আলোকিত চন্দ্রের অংশবৃদ্ধির নাম,

কলাবৃদ্ধি। এই ১৫টি দিন লইয়া এক পক্ষ হয় এবং যে-পক্ষে চন্দ্রের কলার বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে, তাহাকে শুক্ল পক্ষ বলে। পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রের ভোগকাল সমস্ত রাত্রি ধরিয়া চলিয়া থাকে।

তাহার পরদিন হইতে কলা হ্রাস ঘটিতে থাকে। এইরূপে ক্রমশঃ কলা হ্রাস হইতে হইতে ১৫ দিনে আবার চন্দ্র একেবারে অদৃশ্য হইলে অমাবস্যা হয়। এই ১৫টি দিনকে কৃষ্ণ পক্ষ বলে। এই কলা-হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রের ভোগকালও কমিয়া আসে।

চন্দ্রোদয় সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে হইয়া চন্দ্রের ভোগকাল চন্দ্রের কলাবৃদ্ধি অনুসারে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আমাদের বাংলা হিসাবে ৬০ দণ্ডে এক দিন ধরা হয়; তাহা হইলে ১২ ঘণ্টায় ৩০ দণ্ড হয়। শুক্লপক্ষে চন্দ্রের ভোগকাল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ১৫ দিনের দিন পূর্ণিমা তিথিতে সম্পূর্ণ ৩০ দণ্ড ভোগ হয়। সেই জন্য অমাবস্যার পর হইতে প্রতিদিন চন্দ্রের ভোগকাল $\frac{৩০}{১৫}$=২ দণ্ড, প্রায় ৪৮ মিনিট করিয়া বাড়িতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে আপন কক্ষে চন্দ্রের গতি অনুযায়ী এই ভোগকাল প্রতিদিন ৩৮ মিনিট হইতে ৬৬ মিনিট পর্য্যন্ত বাড়ে বা কমে। ঠিক এইরূপে কৃষ্ণপক্ষে ক্রমশঃ চন্দ্রকলা হ্রাস পাইয়া ১৫ দিনের দিন আবার অমাবস্যা তিথি আসিয়া উপস্থিত হয়। এই চন্দ্রকলা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রের ভোগকালও কমিয়া আসিতে থাকে। পূর্ণিমার পরদিন হইতে সূর্য্যাস্তের পর হইতে ২ দণ্ড বাদ দিয়া চন্দ্রোদয় হইতে আরম্ভ হয়, এবং এইরূপে প্রতিদিন ২ দণ্ড পরে পরে চন্দ্রোদয় হওয়ায় চন্দ্রের ভোগকালও ২ দণ্ড করিয়া প্রতিদিন কমিতে থাকে।

৪

সৌরমণ্ডলের জন্ম

রাতের আকাশ

রাত্রের অন্ধকারে আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে যে অসংখ্য নক্ষত্রমণ্ডলী দৃষ্টিগোচর হয়, উহাদিগের মধ্যে কয়েকটি ব্যতীত সকলগুলিই এরূপ বিশাল যে প্রত্যেকটির গর্ভে লক্ষকোটী পৃথিবীর স্থান হইতে পারে। নক্ষত্রগুলিও গুণিয়া শেষ করা যায় না। যতই দিনে দিনে দূরবীক্ষণের উন্নতি হইতেছে, ততই নূতন নূতন বহু নক্ষত্র ধরা পড়িতেছে। পৃথিবীর সকল সমুদ্র-উপকূলস্থ বালুকারাশি গণনা করিলে মহাকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীর সংখ্যার একটা ধারণা হইতে পারে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় আমাদের ধরিত্রীমাতা কত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তাহা সহজেই অনুমেয়।

মহাকাশ কি পরাশূন্য (absolute vacuum) ?

এই অসংখ্য নক্ষত্রমণ্ডলী মহাকাশে অবিরাম ছুটিয়া বেড়াইতেছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটিকে যেন মনে হয় এক একটা নির্দ্দিষ্ট দলে ছুটিতেছে ; অবশিষ্টগুলি একেবারে একা মহাশূন্য মহাকাশে সম্পূর্ণ খেয়ালের বশে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। অসীম মহাকাশে ছুটিয়া বেড়াইবার সময় এইগুলি পরস্পরের নিকট হইতে এত দূরে দূরে থাকে যে একটির অপর কোন একটির গণ্ডির মধ্যে আসিয়া পড়া একটা অসম্ভব দৈব ঘটনা মাত্র বলিয়া বোধ হয়। একটা অসীম অকুল সাগরের কল্পনা কর, উহার মধ্যে কয়েকটি জাহাজ ছুটিতেছে। এই জাহাজগুলির মধ্যে আবার প্রত্যেকটি পরস্পর হইতে দশলক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া ছুটিতেছে ; এরূপ অবস্থায় পরস্পরের সহিত দেখা হইবার সম্ভাবনা যেরূপ সুদূরপরাহত, মহাশূন্যে ছুটন্ত নক্ষত্রমণ্ডলীর পক্ষেও একের অপরের গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়াও ঠিক সেইরূপ সুদূরপরাহত।

ভারতবর্ষে যদি মাত্র তিনটি মৌমাছি মনের আনন্দে বেড়াইত, তাহা হইলে তাহাদিগের পরস্পরের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া কি সম্ভব? মহাকাশের দুইটি

নক্ষত্রের সহিত মুখোমুখী দেখা সাক্ষাৎ হওয়াও নাকি এইরূপ একটা অসম্ভব ব্যাপার।

দুইটি নক্ষত্রের মিলনের ফল

কিন্তু জ্যোতির্বীদিগের বিশ্বাস যে এরূপ অসম্ভব সুদূরপরাহত ঘটনা অতি দূর অতীতে—দুই তিনশত কোটী বৎসর পূর্ব্বে একবার নাকি ঘটিয়াছিল। একটি নিঃসঙ্গ ছুটন্ত পাগল নক্ষত্র অন্ধশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া হঠাৎ আমাদের

সূর্য্যের গণ্ডির মধ্যে আসিয়া পড়ে। আগন্তুক নক্ষত্র অতি বিশাল, তাহার মাধ্যাকর্ষণও তদ্রূপ। আগন্তুক যতই সূর্য্যের নিকটতর হইতে লাগিল, ততই উহার তীব্র আকর্ষণে সূর্য্যের তপ্ত ধূমময় দেহ, চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের জল যেরূপ ফাঁপিয়া উঠে, সেইরূপ ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। চন্দ্রের ক্ষীণ মাধ্যাকর্ষণের সহিত আগন্তুক নক্ষত্রের প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণের তুলনাই চলে না। সূর্য্য ও আগন্তুকের ব্যবধান যতই কমিতে লাগিল, সেই বিরাট নক্ষত্রের তীব্র মাধ্যাকর্ষণের প্রচণ্ডতাও তত বাড়িতে লাগিল। এই প্রচণ্ড টানাটানির ফলে সূর্য্যপৃষ্ঠ ফুলিতে ফুলিতে অবশেষে খণ্ডে খণ্ডে ছিঁড়িয়া পড়িল। তাহার পর পাগল নক্ষত্রটি নিজ পথে ছুটিতে ছুটিতে যখন পুনরায় সূর্য্য হইতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল, তখন সূর্য্যপৃষ্ঠের ছিন্ন অংশগুলিকেও কতকদূরে টানিয়া লইয়া চলিল; কিন্তু উহার টানের তুলনায় নিকটবর্ত্তী সূর্য্যের টান অধিক হওয়ায়, সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিল না। এ যেন পিতার আহ্বান অপেক্ষা মাতার আকর্ষণ অধিক। ফলে সূর্য্যের পুত্রকন্যাগণ মাতার নিকটেই থাকিয়া তাঁহাকে অবিরাম প্রদক্ষিণ করিতে লাগিয়া গেল। এই সূর্য্যের চারিদিকে অবিরাম ভ্রাম্যমান সন্তানগুলির মধ্যে আমাদের পৃথিবী অন্যতম।

দুইটি নক্ষত্রের মধ্যবর্ত্তী সেতু সৃষ্টি

আগন্তুক নক্ষত্রের মাধ্যাকর্ষণে সূর্য্যের ধূমময় পৃষ্ঠদেশ ফুলিতে ফুলিতে পর্ব্বতের মত উচ্চ হইতে লাগিল। এ পর্ব্বত পার্থিব পর্ব্বতের মত চারি পাঁচ মাইল উচ্চ নহে। এ পর্ব্বতের চূড়া লক্ষ লক্ষ মাইল উচ্চ। অবশেষে যখন সূর্য্যের স্ফীত পর্ব্বতাকার পৃষ্ঠদেশ প্রায় ছিঁড়িয়া পড়িয়া মহাকাশে ঝুলিতে লাগিল, তখন এই ধূমময় পর্ব্বতের সূর্য্য-মুখী ভূমি দূরে-সরিয়া-পড়া নক্ষত্রের ক্ষীণ টানে ও নিকটস্থ সূর্য্যের তীব্র টানে ক্রমশঃ আর এক পর্ব্বতের চূড়ায় পরিণত হইল। এই ছিন্ন অংশ নক্ষত্র ও সূর্য্যের দোটানায় পড়িয়া, দুই মুখ সূচাল স্থূলোদর—এমন একটা

সিগারের মত রূপ ধারণ করিল। এইটি হইল দুইটি নক্ষত্রের সাময়িক মিলন-সেতু স্বরূপ। সূর্য্য-প্রদক্ষিণ-রত গ্রহগুলির আকার লক্ষ্য করিলে এই মতবাদ সমর্থিত হয়।

গ্রহের জন্ম

অবশেষে আগন্তুক নক্ষত্র ছুটিতে ছুটিতে সূর্য্যের গণ্ডির বাহিরে অতি দূরে মিলাইয়া গেল বটে, কিন্তু সূর্য্যের ছিন্ন পৃষ্ঠদেশ আর পূর্ব্বের মত জোড়া লাগিল না। ক্রমশঃ সিগারের আকার বিশিষ্ট ধূমময় তপ্ত পদার্থরাশি শীতল হইয়া জমাট বাঁধিতে গিয়া কয়েকটি খণ্ডে ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং নিজেদের ও সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণের ফলে বর্ত্তুলাকার ধারণ করিতে লাগিল। তারপর সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণের ফলে উল্লিখিত বর্ত্তুলাকার পিণ্ডগুলি ক্রমশঃ সূর্য্যের চারিদিকে অবিরাম প্রদক্ষিণ করিবার এক এক সুনির্দ্দিষ্ট পথ করিয়া লইল।
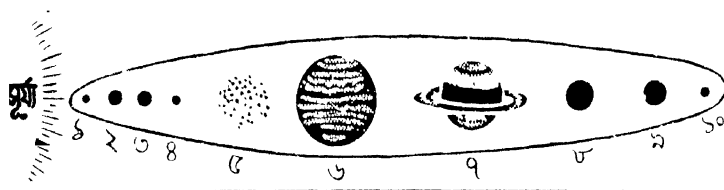
(১) বুধ (২) শুক্র (৩) পৃথিবী (৪) মঙ্গল (৫) অণু-গ্রহপুঞ্জ
(৬) বৃহস্পতি (৭) শনি (৮) উরণাস (৯) নেপচুন (১০) প্লুটো

এইরূপে বোধ হয় সূর্য্যের গণ্ডির মধ্যে কোন এক হঠাৎ-আসা নক্ষত্রের প্রভাবের ফলে সৌরমণ্ডলের (solar system) জন্ম হইয়া থাকিবে।

৫

সূর্য্যের নবগ্রহ

বুধ

সূর্য্যের সন্তানগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে প্রদক্ষিণ করে বুধগ্রহ (Mercury)। যে গ্রহ সূর্য্যের যত নিকটে থাকিয়া প্রদক্ষিণ করে, উহা তত চঞ্চল; উহার গতিবেগ তত অধিক। বুধ সূর্য্যের এত কাছে কাছে ঘোরে যে ইহাকে আকাশে সকল সময়েই সূর্য্যের অতি নিকটেই দেখিতে পাওয়া যায়, ফলে রাত্রে উহাকে দেখিতেই পাওয়া যায় না। দূরবীক্ষণ না থাকিলে ঠিক সূর্য্যাস্তের পরেই গোধূলির সময় পশ্চিম আকাশে বা সূর্য্যোদয়ের ঠিক পূর্ব্বে পূর্ব্ব আকাশে লক্ষ্য করিলে চোখে উহা পড়িতেও পারে। অধিকাংশ সময়ে ইহা দিক্‌চক্রবালের ধোঁয়া ও ধূলির অন্তরালে লুকাইয়া থাকে, সেইজন্য চোখে না পড়াই অধিক সম্ভব।

সূর্য্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিবার সময় উহা কখনও আমাদের অতি নিকটে আসে, কখন বা আমাদের নিকট হইতে অতি দূরে সরিয়া যায়। চন্দ্রের কলাবৃদ্ধি যেরূপ দিনে দিনে দেখিতে পাওয়া যায়, লক্ষ্য করিলে ঠিক সেইরূপ বুধেরও কলাবৃদ্ধি দিনে দিনে চোখে পড়ে।

যখন ইহা ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদের নিকটতম হয়, তখন ইহাকে সূর্য্যের উজ্জ্বল থালির উপরে একবিন্দু কলঙ্কের মত নড়িতে দেখা যায়। তাহার পর দিনে দিনে চাঁদের মত এক ফালি করিয়া ইহার প্রভাময় অংশ বাড়িতে থাকে। চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির মত ইহারও কলার নিয়মিত হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে বলিয়া ইহা যে স্বয়ংপ্রভ নহে, তাহাই প্রমাণিত হয়।

শুক্র

ইহার পরেই শুক্রের (Venus) স্থান। বুধের মত ইহাও সূর্য্যের অতি নিকটে থাকায় ভোরবেলা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশে ও সূর্য্যাস্তের ঠিক পরেই সন্ধ্যায় পশ্চিমাকাশে ইহাকে উঠিতে দেখা যায়। ইহারও চাঁদের মত দিনে দিনে কলার হ্রাস-বৃদ্ধি চোখে পড়ে। সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদের পৃথিবী হইতে ইহার ব্যবধানের এত তারতম্য ঘটে যে, আকাশে উহার আকার বেশ বাড়িতে বা কমিতে দেখা যায়।

যখন ইহা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ হয়, তখন ইহা আকারে বাড়িলেও ইহার মাত্র একফালি চোখে পড়ে। তাহার পর যখন ইহা আমাদের নিকট হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরে গিয়া পড়ে, তখন ইহার ব্যবধান দাঁড়ায় নিকটতম অবস্থার প্রায় ছয় গুণ, সেই জন্যই অতি ক্ষুদ্রাকার দেখায়। নিকটতম অবস্থায় পূর্ণাকারে দেখিতে পাওয়ার উপায় থাকিলে ইহাকে ভয়ঙ্কর উজ্জ্বল দেখাইত; কিন্তু সকল সময়ই সূর্য্যের নিকটেই দেখা যায় বলিয়া সূর্য্যের তীব্র জ্যোতির তুলনায় ইহাকে ক্ষীণ জ্যোতিঃ বলিয়া বোধ হয়। ভোরের ও সন্ধ্যার উজ্জ্বল শুকতারাই এই শুক্র গ্রহ। কখন কখন ইহাকে এত উজ্জ্বল দেখায় যে দিনের আলোকেও বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

পৃথিবী

শুক্রের পরেই পৃথিবীর (Earth) স্থান। ইহা বুধ ও শুক্র অপেক্ষাও আকারে বড়। স্থুলোদর দুই-মুখ-সূচাল সিগার-আকারের সূর্য্যের ছিন্নাংশ হইতে যে নবগ্রহের জন্ম হইয়াছিল, তাহার সহিত বুধ, শুক্র ও পৃথিবীর ক্রমবর্দ্ধমান আকার ও সূর্য্য হইতে ইহাদের দূরত্বের বেশ সামঞ্জস্য আছে। পৃথিবী ও শুক্র আকারে প্রায় সমান, যেন মনে হয় যমজ ভাই ও ভগিনী। উহারা দেখিতে এক হইলেও প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

জীবের প্রাণস্বরূপ অক্সিজেন গ্যাস পৃথিবীতে মুক্ত অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে

পাওয়া যায়। কিন্তু শুক্রগ্রহে উহার অস্তিত্বের বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অক্সিজেনের আসক্তি (অন্য পরমাণুর সহিত মিলিয়া নূতন পদার্থ সৃষ্টি করিবার প্রবৃত্তি) অত্যন্ত বেশী ; সেইজন্য উহাকে সর্ব্বদাই অন্য কোন অণুর সহিত বদ্ধ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ মুক্ত অক্সিজেন ব্যতীত জীবের পক্ষে বাঁচা অসম্ভব। এই সমস্যার সমাধান প্রকৃতি এক অদ্ভুত উপায়ে সিদ্ধ করিয়াছেন। পৃথিবীর প্রতি উদ্ভিদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অঙ্গটি এক একটি অক্সিজেন প্রস্তুতের কারখানা বিশেষ। উদ্ভিদ্ কার্ব্বন-দ্বি-অক্সাইড (Carbon dioxide) নিঃশ্বাসরূপে গ্রহণ করে, এবং প্রশ্বাসরূপে ত্যাগ করে অক্সিজেন। জীবের পক্ষে ঠিক বিপরীত। ফলে, প্রকৃতি এক ঢিলে দুই পাখী মারিয়াছেন : উভয়ের সাহায্যে উভয়ের বাঁচিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। শুক্রগ্রহে মুক্ত অক্সিজেনের অভাব হইতে মনে হয়, ঐ স্থানে উদ্ভিদের অস্তিত্ব নাই। আবার উদ্ভিদ আদি-প্রাণাধার ; সেই জন্য শুক্রগ্রহে কোন প্রকার প্রাণীর অস্তিত্বের বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ হয়।

মঙ্গল আদি গ্রহগুলি

অবশিষ্ট ছয়টি গ্রহের কক্ষ পৃথিবীর কক্ষের বাহিরে থাকায়, মনে হয় যেন উহারা সূর্য্য প্রদক্ষিণ কালে আমাদিগকেও প্রদক্ষিণ করে। সেইজন্য উহাদিগকে সূর্য্যের বিপরীত দিকে রাত্রের অন্ধকার আকাশে প্রায়ই জ্বল জ্বল করিতে দেখা যায়।

ইহাদিগের মধ্যে পৃথিবীর নিকটে থাকে মঙ্গল (Mars) ও বৃহস্পতি (Jupiter)। ইহারা শুক্রগ্রহের তুলনায় দশমাংশ আলো দিলেও দেখায় কিন্তু অধিকতর উজ্জ্বল, কারণ সূর্য্যের তীব্র জ্যোতির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শুক্রের ক্ষীণ আলো তত চোখে পড়ে না।

বাকি চারিটি গ্রহ দেখিতে অত্যন্ত ম্লান। শনিকে (Saturn) সাধারণ নক্ষত্রের মত দেখায়, উরনাস্‌কে (Uranus) নয়নেত্রে চেষ্টা করিলে দেখা যায় বটে, কিন্তু নেপচুন ও প্লুটোকে দেখিতে হইলে শক্তিশালী দূরবীক্ষণ প্রয়োজন।

মঙ্গলগ্রহ (Mars) আকারে পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ইহার আকার "সিগার"-মতবাদের একটা ব্যতিক্রম বলিয়া বোধ হয়। বৃহস্পতির আকার দেখিয়া মনে হয়, প্রকৃতি মঙ্গলগ্রহের ব্যতিক্রমের যেন পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। ইহার ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের এগারগুণ এবং ইহা ওজনে পৃথিবীর তিনশত সতের গুণ। ইহাকে সৌর পরিবারে দৈত্য বলিলেও চলে। বাকি আটটির সমষ্টি ও ওজনের দ্বিগুণ ইহার ওজন। দূরত্বে ইহা সূর্য্য হইতে পঞ্চম, ইহা সূর্য্যপৃষ্ঠ হইতে ছিন্ন সিগারাকারের মধ্যাংশ, সেইজন্য ইহার ওজন ও আকার এত ভয়ঙ্কর। বৃহস্পতির পরের গ্রহগুলি উল্লিখিত সিদ্ধান্তানুযায়ী পূর্ব্বের মত আকারে ও ওজনে ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহস্পতির পর শনি। ইহা উপাদানে বৃহস্পতির এক তৃতীয়াংশ মাত্র। সিগারের একপ্রান্তে অবস্থিত প্লুটো আকারে অন্য প্রান্তে অবস্থিত বুধেরই অনুরূপ।

৬

গ্রহগুলির জলবায়ু

দূরবীক্ষণের শক্তি

দূরবীক্ষণের কাজ দূর উৎস হইতে আগত ক্ষীণ আলোক এক স্থানে কেন্দ্রীভূত করিয়া উজ্জ্বল করিয়া তোলা। ফলে, ইহারা উক্ত উৎস হইতে আগত তাপও ধরিতে পারে। আধুনিক শক্তিশালী দূরবীক্ষণগুলি এমনই স্পর্শকাতর যে শত শত মাইল দূরে অবস্থিত একটিমাত্র জলন্ত মোমবাতির তাপের পরিমাণ সঠিক ধরিয়া দিতে পারে। এই কারণে নিকটস্থ গ্রহগুলি বা উজ্জ্বল তারাগুলি যে পরিমাণ তাপ মহাকাশে অবিরত ছড়াইতেছে উহা সঠিক বলিয়া দেওয়া আজ জ্যোতিবীর পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার।

গ্রহের তাপ ও আলো দিবার ক্ষমতা

গ্রহগুলি যে স্বয়ংপ্রভ নহে ইহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। এইগুলি যখন প্রথমে সূর্য্যপৃষ্ঠ হইতে ছিন্ন হইয়া আগুণের ফিন্‌কির মত স্বাধীন সত্ত্বালাভ করিয়াছিল, তখন এইগুলি হইতে প্রায় সূর্য্যেরই মত তাপ ও আলোক বিকীর্ণ হইত। কিন্তু সে প্রায় দুইশত কোটি বৎসর পূর্ব্বের কথা। এই সুদীর্ঘ কালে গ্রহগুলি তাপ ও আলোক দান করিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে ; ফলে এখন আর তাহাদের নিজস্ব তাপ বা আলোক দিবার ক্ষমতা নাই বলিলেই হয়। এখন সূর্য্য হইতে যেটুকু তাপ ও আলোক পায় ততটুকুই উহারা বিকীরণ করে। এইরূপ অবস্থায় যে গ্রহ সূর্য্য হইতে যত দূরে অবস্থিত, সেইটি তত শীতল। দূরবীক্ষণের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়।

মহাকাশে সুখকর মণ্ডল

মহাকাশের সর্ব্বত্র অতি শীতল, এত শীতল যে আমরা সে ভয়ঙ্কর শৈত্যের কোন কল্পনাই করিতে পারি না। এই অতি শীতের স্থানে স্থানে মনে হয় কতক গুলি অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে। এই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডগুলিই সূর্য্য ও তারকামণ্ডলী। এই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডগুলির যত নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়, ততই তাপ ও আলোক বাড়িতে থাকে। ক্রমশঃ আরও নিকটবর্ত্তী হইলে তবে একটা সুখকর মণ্ডল পাওয়া সম্ভব। এই তাপ ও আলোক-প্রাপ্ত সুখকর মণ্ডলে যদি কোন গ্রহ থাকে, তবেই সেখানে প্রাণের বিকাশ হওয়া সম্ভব। সৌভাগ্যবশতঃ পৃথিবী সূর্য্যের উল্লিখিত সুখকর মণ্ডলে অবস্থিত।

কোন্ কোন্ গ্রহে প্রাণের সম্ভাবনা ?

পৃথিবী-কক্ষের বাহিরের দিকের গ্রহগুলি এত শীতল যে সেখানে কোন প্রকার পার্থিব প্রাণের বিকাশ সম্ভব নহে। বৃহস্পতি গ্রহও কল্পনাতীত শীতল। ফারন্‌হাইট্ (Fahrenheit) হিসাবে ঐ স্থানের শৈত্য বরফের পরেও ২৭০ ডিগ্রি। এই প্রকার শীতে আমাদের বায়ুমণ্ডলের গ্যাসগুলি জমাট ও তরল আকার

ধারণ করিবে। কিন্তু এত শীতেও বৃহস্পতিপৃষ্ঠে মেঘের সঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় তথাকার মেঘ কার্ব্বন-দ্বি-অক্সাইড (Carbon-di-oxide) বা তৎসম কোন গ্যাস হইতে জন্মে। এই সকল গ্রহে জীবকুলের বাসের সম্পূর্ণ প্রতিকূল অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

পৃথিবীর যমজ মঙ্গল গ্রহের আবহাওয়া উহাদের তুলনায় মন্দের ভাল। ইহার পৃষ্ঠদেশের আবহাওয়া বরফের অপেক্ষাও শীতল। দ্বিপ্রহরে মাথার উপরে সূর্য্য আসিলে উহার বিষুবমণ্ডল কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত হয় বটে, কিন্তু মঙ্গলগ্রহে কোন বায়ু-মণ্ডল না থাকায় ঐ তাপটুকুও উহার ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই। ইহা হইতে প্রতিফলিত আলোকের গুণাগুণ বিচার করিয়া মনে হয়, ইহার উপরিভাগ চন্দ্রের মত প্রধানতঃ আগ্নেয়গিরি-নিঃসৃত ভস্মপূর্ণ। এই ভস্মেরও তাপ ধারণ করিবার কোন শক্তি নাই; ফলে মঙ্গলগ্রহে সূর্য্য ডুবিয়া গেলে তীব্র শীতের প্রকোপ অতি দ্রুতই অনুভূত হয়। এই গ্রহে সন্ধ্যার পূর্ব্বে বরফ পড়িতে আরম্ভ করে এবং দ্বিপ্রহর রাত্রে মঙ্গল গ্রহের বিষুবমণ্ডলে আমাদের মেরুপ্রান্তের তীব্র শীত আসিয়া পড়ে। সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী দুইটি গ্রহের আবহাওয়া এতই উত্তপ্ত যে ঐগুলিতে বাস করা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে বাস করারই মত। একমাত্র আমাদের পৃথিবীর আবহাওয়াই সুখকর ও প্রাণের বিকাশের সম্পূর্ণ অনুকূল।

মঙ্গল গ্রহেও কি প্রাণের বিকাশ সম্ভব ?

মঙ্গলগ্রহ পৃথিবী কক্ষের বাহিরে থাকিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। ফলে ইহার আবহাওয়া পৃথিবী অপেক্ষা শীতল হইলেও প্রাণের বিকাশের পক্ষে একেবারে প্রতিকূল নহে। কোন কোন জ্যোতিষীর বিশ্বাস যে ঐ গ্রহে মানবজাতির মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান প্রাণীর বিকাশ হইয়াছে এবং উহাদিগের পূর্ত্তবিভাগীয় কীর্ত্তিকলাপ নাকি তাঁহারা মাঝে মাঝে দূরবীক্ষণ সাহায্যে দেখিতে পান। কিন্তু মানুষের দৃষ্টিশক্তিকে নিকটস্থ বিষয় সম্পর্কেই যখন বিশ্বাস করা যায় না, তখন লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে স্থিত গ্রহ উপগ্রহাদির ক্ষুদ্র বিষয়গুলি সম্পর্কে কোন কথাই জোর করিয়া বলা চলে না।

কিন্তু একটি বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। মঙ্গল গ্রহে কয়েকটি আর্ত্তব (seasonal) পরিবর্ত্তন নিয়মিত লক্ষ্য হয়। মঙ্গলগ্রহে যখন শীতকাল, তখন উহার উত্তরমেরুপ্রান্তে বহু যোজন ব্যাপিয়া শ্বেত বরফের আচ্ছাদনের আবির্ভাব ঘটে। পুনরায় গ্রীষ্মকালে এই জমাট বরফের আচ্ছাদন গলিতে দেখা যায়। যখন উত্তরপ্রান্তে বরফ গলিয়া পরিষ্কার হইতে থাকে, তখন ইহার দক্ষিণপ্রান্তে নানারূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন যে দেশের উক্তরূপ পরিবর্ত্তন বরফ গলিবার পরে উদ্ভিদের বিকাশের ফলে ঘটিয়া থাকে। আবার কেহ কেহ বলেন প্রাণহীন আগ্নেয় শিলাভস্ম-পূর্ণ মরুদেশে এইকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া ঐরূপ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মঙ্গলগ্রহে প্রাণের বিকাশ হইয়াছে কি হয় নাই, এই মতবাদ সম্পর্কে বিরোধ থাকিলেও ঐ গ্রহে প্রাণের বিকাশ হয় নাই—এরূপ কথা একেবারে জোর করিয়া বলা যায় না।

৭
গ্রহের উপগ্রহ

উপগ্রহের জন্ম

যে যত শক্তিশালী তাহার দলবল সংখ্যায় তত অধিক। গ্রহের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। শনি ও বৃহস্পতি গ্রহদ্বয়ের প্রত্যেকের নয়টি করিয়া উপগ্রহ আছে। ইহাদের পরেই আকারে উরণাসের স্থান ; উহার চারিটি উপগ্রহ। তাহার পর আকার অনুযায়ী প্রতি গ্রহের দু'টি একটি করিয়া উপগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। বুধ, প্লুটো আদি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র গ্রহগুলির কোন উপগ্রহই নাই। জ্যোতিষীদিগের বিশ্বাস সূর্য্যপিণ্ডের কতকাংশ যেমন কোন বিশালতর তারকার আকর্ষণের ফলে ছিন্ন হইয়া বাহির হইয়া আসায় গ্রহগুলির

জন্ম হইয়াছিল, ঠিক সেইভাবেই সূর্য্যের আকর্ষণে গ্রহপিণ্ডের কতক কতক অংশ ছিন্ন হইয়া মহাকাশে ছিট্‌কাইয়া পড়ায় উপগ্রহগুলির জন্ম হইয়া থাকিবে।

গ্রহের বিপদগণ্ডি

মাধ্যাকর্ষণের বিধি অনুযায়ী হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে মহাকাশের প্রতি ঘূর্ণমান পিণ্ডটির ঠিক চারিদিকে একটি নির্দ্দিষ্ট বিপজ্জনক গণ্ডি (danger zone) আছে। যখন কোন পিণ্ড ছুটিতে ছুটিতে কোন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পিণ্ডের নিকটে আসিয়া পড়ে, তখন ঐ বৃহৎ পিণ্ডটি আপন তীব্র মাধ্যাকর্ষণে উহাকে উল্লিখিত বিপদগণ্ডির মধ্যে টানিয়া লয়। এইরূপ অবস্থায় বৃহতের তীব্র মাধ্যাকর্ষণে ক্ষুদ্র পিণ্ডটি ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে। কোন ক্ষুদ্র পিণ্ডই ছুটিতে ছুটিতে কোন বৃহৎ পিণ্ডের বিপদগণ্ডির মধ্যে আসিয়া অক্ষত দেহে ফিরিয়া যাইতে পারে না। বিপদগণ্ডির মধ্যে থাকিবার সময়ের উপর ক্ষুদ্র পিণ্ডের ক্ষতির পরিমাণ নির্ভর করে।

জ্যোতিষীদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, দুই-তিনশত কোটি বৎসর পূর্ব্বে অনুদ্দিষ্ট পথে ছুটিতে ছুটিতে সূর্য্য কোন বিশালতর নক্ষত্রের বিপদগণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করায় নবগ্রহের জন্ম হয়। এই সদ্যোজাত গ্রহগুলির কক্ষসমূহ তখন বর্ত্তমানের মত সুনির্দ্দিষ্ট হইতে সময় পায় নাই। উহারাও কালক্রমে সূর্য্যের বিপদগণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকিবে এবং এইরূপ দুর্ঘটনায় উহাদিগের দেহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া উপগ্রহগুলি জন্মিয়া থাকিবে। সূর্য্যের সহিত গ্রহগুলির যে সম্পর্ক, গ্রহগুলির সহিত উপগ্রহগুলিরও সেই সম্পর্ক দেখিয়া মনে হয় যে, গ্রহ ও উপগ্রহগুলি একই অবস্থার গুণে জন্মিয়া থাকিবে।

৮

শনির পিণ্ডমালা

গ্যালিলিওর আবিষ্কার

দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে শনি গ্রহের আকারে একটা বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। ইহার চারিদিকে ভ্রাম্যমান নয়টি উপগ্রহ ব্যতীত মধ্যস্থলে তিনটি চেপ্টা গোলাকার চক্র ইহাকে বেড়িয়া আছে। এই শনির চক্র তিনটি সর্ব্বপ্রথম ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত জ্যোতিষী গ্যালিলিওর (Galileo) দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
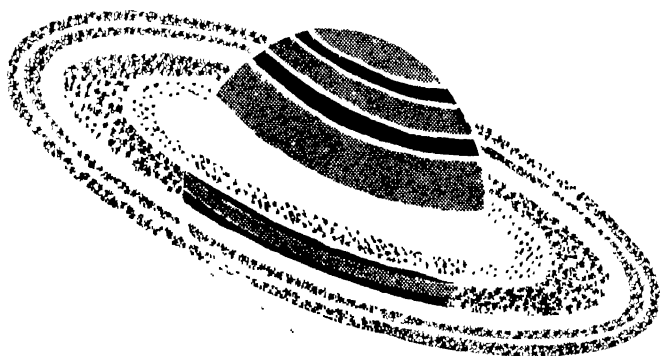
শনি ও উহার পিণ্ডমালা

তাহার পর এইগুলির সম্পর্কে বহু মতবাদ গড়িয়া উঠে। ১৭৫০ খৃঃ টমাস্ রাইট (Thomas Wright) প্রচার করেন যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগ্রহ একই কক্ষে একই দিকে ছুটিতে ছুটিতে শনিকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকায় দৃশ্যতঃ এইরূপ চক্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

পিণ্ডমালার কারণ

নানাদিক দিয়া বিচার করিলে মনে হয় শনিগ্রহের বিপদগণ্ডির মধ্যে উহার কোন পূর্ণাবয়ব উপগ্রহ আসিয়া পড়ায় শনির প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণে উহা শত সহস্র খণ্ডে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া এইরূপ বিশাল কটিবন্ধ তিনটিতে (belt) পরিণত হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কোন এক প্রবল নক্ষত্রের প্রচণ্ড আকর্ষণে সূর্য্যের অঙ্গ ছিঁড়িয়া নবগ্রহের জন্ম হয়। আবার অনুরূপ কারণে সূর্য্যের প্রচণ্ড আকর্ষণে সদ্যোজাত গ্রহগুলির কোমল অঙ্গ ছিঁড়িয়া উহাদিগের উপগ্রহগুলি জন্মিয়া থাকিবে। নক্ষত্র ও সূর্য্য উভয়েই প্রচণ্ড বেগে মহাকাশে ছুটিতে ছুটিতে উভয়ে উভয়ের সান্নিধ্য লাভ করায় এইরূপ একটা দুর্ঘটনা ঘটিল বটে, কিন্তু উভয়ে উভয়ের সান্নিধ্যে অধিক কাল থাকিতে না পাওয়ায় উক্ত দুর্ঘটনায় সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল না ; সূর্য্যের কোমল ছিন্ন অংশ লক্ষ কোটি অংশে বিভক্ত হইবার সময় পাইবার পূর্ব্বেই একে অপরের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেল। ফলে জন্মিল মাত্র নয়টি পূর্ণাঙ্গ গ্রহ ও এক গুচ্ছে বাঁধা এক রাশ অণু-গ্রহ পুঞ্জ (Asteroids)।

শনির উপগ্রহগুলির জন্মের কারণও অনুরূপ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সদ্যোজাত উপগ্রহগুলির মধ্যে একটি বোধ হয় উহাকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে শনির বিপদগণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করিয়া পড়িল। প্রবলের সহিত বন্ধুত্ব করিবার ফল শীঘ্রই ফলিল ; উহা প্রবলের প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণে ক্রমশঃ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া শত সহস্র খণ্ডে পরিণত হইল। বিপদগণ্ডি হইতে সময়মত পলাইতে পারিলে ইহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইত না, বোধ হয় কয়েকটি ক্ষুদ্রতর উপগ্রহে পরিণত হইত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উক্ত দুর্ঘটনায় উল্লিখিত উপগ্রহের সর্ব্বনাশ হইল ; উহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া লক্ষ কোটি খণ্ডে পরিণত হইয়া শনির তিনটি গোলাকার কোটি-বন্ধ গড়িয়া তুলিল।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে শনি গ্রহের নিকটতম উপগ্রহটি উহার বিপদ-গণ্ডির ঠিক বাহিরে থাকিয়া উহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে ; কিন্তু চক্র তিনটি এই গণ্ডির ভিতরে থাকিয়া ঘুরিতেছে। যে উপগ্রহটিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া শনিগ্রহ

আপনার পিণ্ডমালায় পরিণত করিয়াছে, অভিমন্যুর মত ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, উহার আর বাহির হইবার শক্তি ছিল না।

সৌরমণ্ডলে আর কোন উপগ্রহকেই উহার গ্রহের বিপদগণ্ডির মধ্যে থাকিয়া ঘুরিতে দেখা যায় না। বৃহস্পতির নিকটতম উপগ্রহটি উহার বিপদগণ্ডির অতি সন্নিকটে ঘুরিতে দেখা যায়। কালক্রমে এইটি ঘুরিতে ঘুরিতে বিপদগণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করিয়া পড়িবে। তখন প্রবল বৃহস্পতির প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণে উহা হয়ত লক্ষ কোটি খণ্ডে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া একাধিক পিণ্ডমালারূপে উহার কটিকে বেড়িয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিবে।

পিণ্ডমালার মাপ

শনির পিণ্ডমালাত্রয়ের বিস্তৃতি ৪২,০০০ মাইল, কিন্তু বেধ মাত্র একশত মাইল। বাহিরের মালাটী ১২,০০০ মাইল চওড়া, তাহার পর ১৮,০০ মাইল ফাঁক। এই ফাঁকের পরে ১৭,০০০ মাইল বিস্তৃত মধ্য মালাটি। এইটিই উজ্জ্বলতম কটিবন্ধ। শনির সাত আট হাজার মাইল দূরে ১১,০০০ মাইল বিস্তৃত ভিতরের মালাটী।—এই মালাটি অর্দ্ধ স্বচ্ছ।

কে জানে দূর ভবিষ্যতে আমাদের এত সাধের চাঁদও একদিন পৃথিবীর সান্নিধ্য লাভে কৃতার্থ হইয়া উহার কয়েকটি পিণ্ডমালায় পরিণত হইবে কি না? তখন চাঁদের অস্তিত্ব না থাকিলেও চাঁদের আলো নিভিয়া না গিয়া বরং শতগুণে বৃদ্ধি পাইবে। চাঁদের কলার হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য আলোর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। তখন এ অসুবিধা থাকিবে না, তখন সারা বৎসর ধরিয়া সারারাত্রি শত পূর্ণিমার উজ্জ্বল আলোকে ধরণী হাসিতে থাকিবে। তখন প্রদীপের প্রয়োজন থাকিবে না। এইরূপ ব্যবস্থায় রাত্রে আলোর প্রাচুর্য্য ঘটিলেও অন্যদিকে কয়েকটি অসুবিধাও ঘটিবে। পিণ্ডমালার পিণ্ডগুলির মধ্যে মাধ্যাকর্ষণের ফলে ঠোকাঠুকি লাগিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইলে পৃথিবী বক্ষে ঐ ভাঙ্গা পাথরের বৃহৎ টুকরাগুলি নামিয়া আসিয়া বহু লোকের সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিবে। বর্ত্তমানে জোয়ার ভাঁটার ফলে বহু নদীপথ নাব্য, কিন্তু তখন ঐ নদীপথগুলি জোয়ার ভাঁটার অভাবে আর নাব্য থাকিবে না।

৯

অণু-গ্রহপুঞ্জ

মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহদ্বয়ের মধ্যস্থলে সহস্র সহস্র অতি ক্ষুদ্র গ্রহের এক গুচ্ছ সূর্য্যকে নিয়মিত মাধ্যাকর্ষণ বিধি অনুসারে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সম্ভবতঃ এই
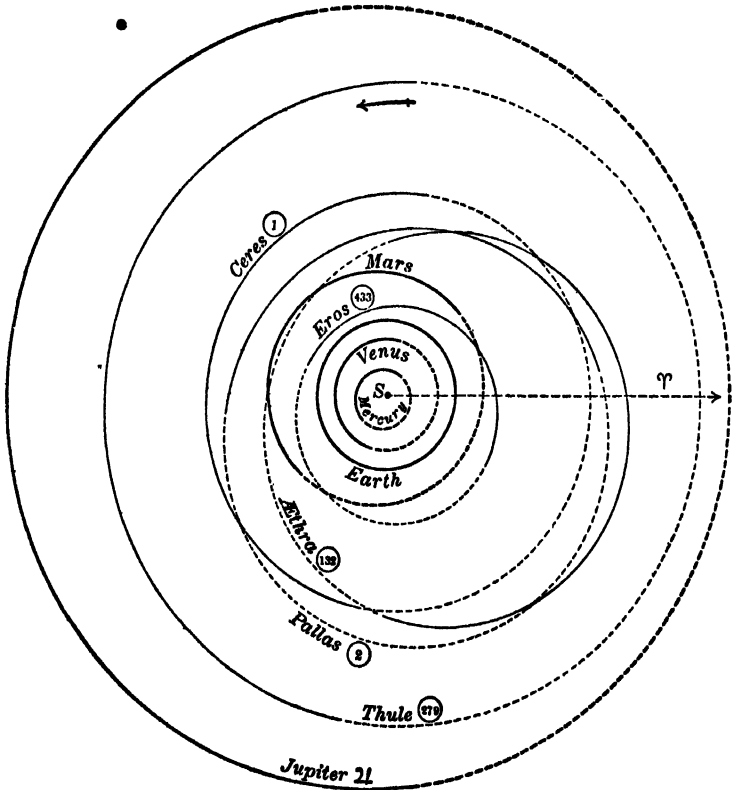
অণু-গ্রহপুঞ্জ এক পূর্ণাঙ্গ গ্রহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। মঙ্গল ও

বৃহস্পতি গ্রহদ্বয়ের মধ্যে সৌরমণ্ডলের অনুশাসনের ব্যতিক্রম স্বরূপ এক বিস্তৃত ব্যবধান থাকায় স্বতঃই মনে হয় যে উহাদিগের মধ্যে আদিকালে আর একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রহ ছিল। কালক্রমে উহা বৃহস্পতির বিপদগণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করিয়া পড়ায় সহস্র সহস্র খণ্ডে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া উক্ত অণু-গ্রহপুঞ্জ গড়িয়া তুলিয়াছে।

মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে একটা অস্বাভাবিক ব্যবধান সর্ব্বপ্রথম জর্ম্মণ গণিতজ্ঞ কেপলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি এ বিষয় ১৭৭২ খ্রীঃ পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বহু অনুসন্ধানেও কোন গ্রহের সন্ধান মিলিল না।

১৮০১ খৃঃ ১লা জানুয়ারী পিয়াজী নামে একজন সিসিলিবাসী সর্ব্বপ্রথম একটি ক্ষুদ্র গ্রহকে ঐ ব্যবধানের মধ্যে থাকিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে দেখেন। তিনি সিসিলি দ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামানুকরণে ইহার নাম রাখেন সিরিস্ (Ceres)। কিন্তু গণনার সহিত ইহার আকারাদির কোন মিল পাওয়া গেল না। আবার সতর্ক অনুসন্ধান চলিতে লাগিল।

১৮০২ খৃঃ পালাস (Pallas) নামে আর একটি ক্ষুদ্র গ্রহ উক্ত ব্যবধানে ছুটিতে দেখা গেল। জুনো (Juno) নামে তৃতীয়টী ধরা পড়িল ১৮০৪ খৃঃ।

জর্ম্মণ পণ্ডিত ওলবার্স (Olbers) সাহেব সর্ব্বপ্রথম বলেন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহগুলিকে ঐ মঙ্গল ও বৃহস্পতির অস্বাভাবিক ব্যবধানের মধ্যে একই দিকে ছুটিতে দেখিয়া মনে হয় এইগুলির জন্ম কোন একটি বৃহৎ পূর্ণাঙ্গ গ্রহ ভাঙ্গিয়া গিয়া হইয়া থাকিবে। এই মতবাদের সহিত সিগার-মতবাদের বেশ মিল দেখিতে পাওয়া যায়। ওলবার্স সাহেব ১৮০৭ খৃঃ ভেষ্টা (Vesta) নামে চতুর্থটি আবিষ্কার করেন, তাহার পর বহুদিন আর কোন নূতন গ্রহ ঐ ব্যবধানে ধরা পড়িল না।

১৮৪৫ খৃঃ পঞ্চমটি আষ্ট্রিয়া (Astroea) ধরা পড়িল। ১৮৪৭ খৃঃ আরও তিনটির অনুসন্ধান মিলিল। আকাশের আলোক-চিত্র (ফটোগ্রাফ্) গ্রহণের উন্নতি হওয়ায় ক্যামেরার সাহায্যে ঐ পথে ক্ষুদ্র গ্রহগুলির নূতন করিয়া

অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। এই নূতন উপায়ে আজ পর্য্যন্ত প্রায় হাজারটি ক্ষুদ্র গ্রহ *ঐ পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে দেখা গিয়াছে।*

ইহাদিগের মধ্যে বৃহত্তমটির ব্যাস মাত্র ৪৮৫ মাইল, নাম সিরিস। তাহার পরেরটির নাম পালাস, ব্যাস ৩০৪ মাইল। তাহার পর আকারে ভেষ্টা, ব্যাস ২৪৪ মাইল। এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত অণু-গ্রহগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতমটির ব্যাস মাত্র ৫৫০ গজ।

ধূমকেতু ও উল্কাপিণ্ড

সৌর পরিবারের অন্যান্য সভ্যেরা আকারেও ক্ষুদ্র ও সম্পর্ক হিসাবেও খুব নিকট বলা চলে না। আমাদের দেশে দেখা যায় প্রতি বড় পরিবারে এমন অনেক লোক বাস করেন, যাহাদিগকে আত্মীয়ও বলা চলে না অথচ পরিবারের যে একজন সে কথাও অস্বীকার করা চলে না। সৌর পরিবারভুক্ত ঐরূপ আত্মীয় ও অনাত্মীয়ের মাঝামাঝি দুইদল পিণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম আকারে ও প্রাধান্যে ধূমকেতু ; দ্বিতীয় উল্কাপিণ্ড।

ধূমকেতু সূর্য্যের তীব্র আলো ও তাপ গণ্ডির মধ্যে না আসা পর্য্যন্ত অদৃশ্যই থাকে। তাহার পর উক্ত গণ্ডির মধ্যে আসিয়া পড়িলেই উহা নিজস্ব প্রকৃত বৈশিষ্ট্যের অতিরিক্ত এক বিশেষ রোমাঞ্চকর প্রাধান্য লাভ করে।

ধূমকেতুর কক্ষ

এপর্য্যন্ত প্রায় চারিশতের অধিক ধূমকেতুর কক্ষ কষিয়া বাহির করা হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই পরাবৃত্ত (Hyperbola) পথে সূর্য্যকে এক কেন্দ্রে রাখিয়া একেবারে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। পরাবৃত্ত বা অধিবৃত্ত (Parabola) পথে চলা কোন পিণ্ড অনন্ত পথেরই যাত্রী। উহা আর সৌরমণ্ডলে কোনদিন ফিরিয়া আসিবে না।

এই কয়েক শত ধূমকেতুর মধ্যে মাত্র আশি নব্বইটি উপবৃত্ত পথে সূর্য্যকে এক কেন্দ্রে রাখিয়া অবিরাম ছুটিতেছে। এই উপবৃত্তীয় ধূমকেতুগুলির মধ্যে
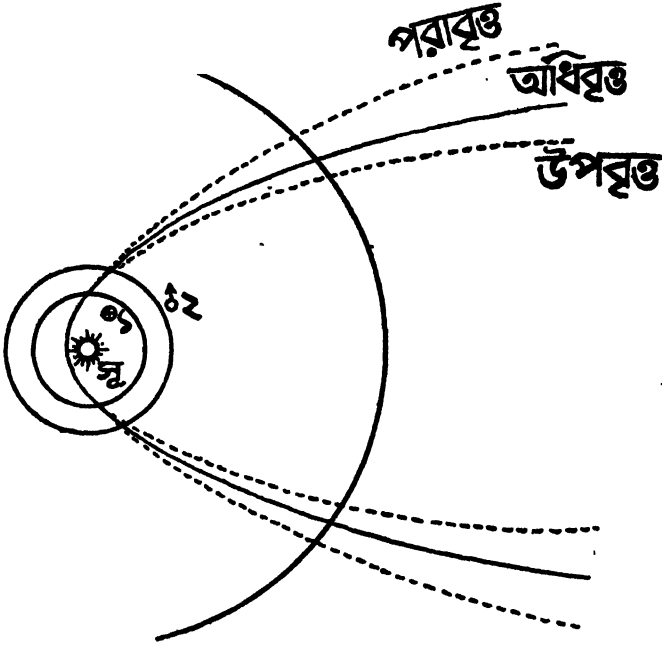
হেলীর ধূমকেতুটিই বিখ্যাত। ইহা আপন কক্ষ পথে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রায় ৭৫ বৎসর অন্তর একবার করিয়া পৃথিবীর নিকটস্থ হয়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এই ধূমকেতুকে শেষ দেখা গিয়াছিল।

এই ধূমকেতু গ্রহগুলির ন্যায় সূর্য্যকে উপবৃত্তের (Ellipse) এক কেন্দ্রে রাখিয়া উহাকে নিয়মিত প্রদক্ষিণ করে। গ্রহগুলির কক্ষ প্রায় গোলাকার, কিন্তু ধূমকেতুর কক্ষ ডিম্বাকার। এই উপবৃত্তের প্রস্থ অপেক্ষা দৈর্ঘ্য বহুগুণ অধিক। ফলে ধূমকেতুর সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার কালে কখনও উহার অতি নিকটে

আসিয়া পড়ে, আবার কখনও আকাশের মৃত্যুশীতল কোন এক গহন কোণে সূর্য্য হইতে বহুদূরে সরিয়া যায়।
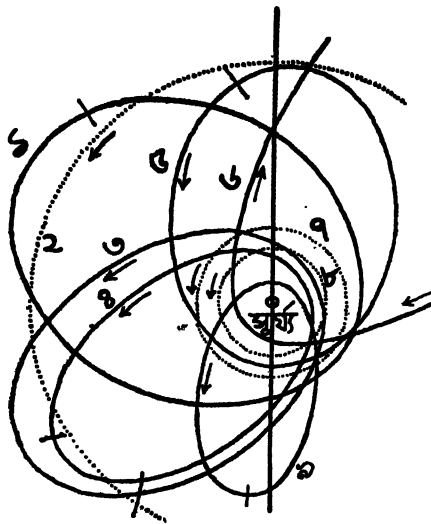
যিনি যে ধূমকেতুটি প্রথম দেখিয়াছেন, তাঁহার নামানুসারে ধূমকেতুর নাম রাখা হয়।

(১) ফাই (Faye) কক্ষ (২) বৃহস্পতির কক্ষ (৩) বেলার (Biela) কক্ষ
(৪) ব্রোসেনের (Brosen) কক্ষ (৫) দে ভিকোর (De Vico) কক্ষ
(৬) হেলির কক্ষ (৭) মঙ্গল গ্রহের কক্ষ (৮) ইরস্ অণু-গ্রহের কক্ষ
(৯) এনকের (Encke) কক্ষ

ইহাদিগের মধ্যে প্রায় বারটি ধূমকেতুর কক্ষ উপবৃত্তাকার হইলেও উহা এত দীর্ঘ যে উহাকে একবার পরিক্রম করিতে হাজার বৎসরেরও অধিক লাগে। প্রায় ৭৫টির কক্ষ সুনিশ্চিতভাবে উপবৃত্তাকার। প্রায় ৬০টির কক্ষ পরিভ্রমণ করিতে শত বৎসরেরও কম সময় লাগে।

যে ধূমকেতুগুলির কক্ষ পরিক্রম করিতে আট বৎসর পর্য্যন্ত সময় লাগে,

উহাদিগকে বৃহস্পতির পরিবারভুক্ত বলা হয়। ইহারা সংখ্যায় প্রায় ত্রিশটি। শনির এইরূপ দুইটি, উরণাসের দুইটি, নেপচুনের ছয়টি ধূমকেতু এ পর্যন্ত ধরা পড়িয়াছে। হেলির ধূমকেতু নেপচুন পরিবারের একটি।

বলাই বাহুল্য যে ধূমকেতুগুলি পরাবৃত্ত বা অধিবৃত্ত পথে আমাদের সৌর-মণ্ডলে প্রবেশ করে, সেগুলি মহাকাশের অন্তহীন গর্ভদেশের কোন্ কোণ হইতে আসে বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন ঐরূপ অনন্ত পথের যাত্রীগুলির মধ্য হইতে কয়েকটি সৌরমণ্ডলে আসিয়া বৃহস্পতি আদি গ্রহের আকর্ষণে বদ্ধ হইয়া পড়িলে সৌরমণ্ডলেই উপবৃত্ত পথে ঘুরিতে থাকে।

ধূমকেতুর বৈশিষ্ট্য

ধূমকেতুর প্রথম বৈশিষ্ট্য, এক প্রকার অল্পপ্রভ স্বচ্ছ উপাদানে গঠিত ইহার বায়বীয় আবরণ (coma)। দূর হইতে অনেকাংশে নীহারিকার মত দেখায়।

ধূমকেতুর মাথা (Nucleus)

তাহার পরেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইহার মাথাটি (Nucleus)।

ধূমকেতু সূর্য্যের নিকটস্থ হইলে তবে এইটি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা অতি উজ্জ্বল দেখিতে এবং প্রায়ই আবরণের মধ্যস্থলে ইহার স্থান। কোন কোন ধূমকেতুর একাধিক মাথা দেখিতে পাওয়া যায়।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, ইহার পুচ্ছ। ছোট বড় প্রায় সকল ধূমকেতুর পিছনে পিছনে চলে একপ্রকার অজানা আলোর স্রোত। ধূমকেতু সূর্য্যের নিকটস্থ হইতে থাকিলে

ধূমকেতুর পুচ্ছ

উহার পুচ্ছটি মস্তককে অনুসরণ করিতে থাকে। আবার যখন ধূমকেতুটি সূর্য্য হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে থাকে, তখন ঐ পুচ্ছটিকে উহার আগু আগু চলিতে দেখা যায়। মোটের উপর সূর্য্য ও পুচ্ছের মাঝখানে ধূমকেতুর মাথাটি সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য, ইহার আলোকময় কোষ কয়টি। এইগুলিকে দূর হইতে মনে হয় যেন মাথা হইতে আলোক বিকীর্ণ হইয়া সমকেন্দ্রীয় কয়টি কোষ গড়িয়া তুলিয়াছে। এই বৈশিষ্ট্য অত্যুজ্জ্বল ধূমকেতুর ছাড়া অন্যতে ধরা পড়ে না।

ইহারাও বৃহস্পতি বা সূর্য্যের মত কোন প্রবল পিণ্ডের বিপদগণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করিলে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া রাশি রাশি প্রস্তরখণ্ডে পরিণত হইয়া আকাশে পরিভ্রমণ করে। এই আগ্নেয় প্রস্তরখণ্ডগুলিকে উল্কাপিণ্ড বলে। কখন কখন পৃথিবী সূর্য্য প্রদক্ষিণ কালে ঐরূপ কোন এক উল্কাপিণ্ডের ঝাঁকের মধ্যে প্রবেশ করে। তখন কতক উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণে উহার বক্ষে অতি দ্রুত নামিয়া আসে। ঐগুলি অতি বেগে বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া ধরাবক্ষে নামিবার সময় বায়ুর সংঘর্ষে অতি তপ্ত হইয়া জ্বলিয়া উঠে; তখনই উহা আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কখন কখন নির্দ্দিষ্ট উপবৃত্তাকারে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে কোন কোন ধূমকেতুকে আর নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুরাতন পথে ফিরিয়া আসিতে দেখা যায় না। তাহার পরই কোন কোন উল্কাপিণ্ডের ঝাঁককে ঐরূপ কোন এক পরিচিত ধূমকেতুর কক্ষে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে হঠাৎ দেখা যায়।

এই অবস্থায় স্বতঃই মনে হয় যে ঐ পথের ধূমকেতুটি কোন এক প্রবলাকার পিণ্ডের বিপদগণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করিয়া পড়ায় চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া উল্কাপিণ্ডের এক বিশাল ঝাঁকে পরিণত হইয়াছে।

সৌরমণ্ডলের ইতিহাসই তাই; একের সহিত অপরের সংঘর্ষে নয়,—প্রবলের মাধ্যাকর্ষণে দুর্ব্বলের অঙ্গ ছিঁড়িয়া একাধিক খণ্ডে পরিণত হইয়াছে।

অধিকাংশ উল্কাপিণ্ড আকারে অতি ক্ষুদ্র, একটি বড় কুলের মত দেখিতে। এইরূপ উল্কাখণ্ড আমাদের বায়ুমণ্ডলে অতি বেগে প্রবেশ করিলেই, ধরাবক্ষ স্পর্শ করিবার বহু পূর্ব্বেই বায়ুর সংঘর্ষে জ্বলিয়া বায়বীয় আকার গ্রহণ করে। এই জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের জ্যোতিষ্মান্ ভস্মরাশি উহার পথ আলোকিত করিয়া তুলিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কখন কখন কোন বৃহৎ উল্কাখণ্ডও পৃথিবী কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়। তখন উহা বায়ুমণ্ডলের সংঘর্ষে জ্বলিয়া উঠিলেও বায়বীয় আকার গ্রহণ না করিয়া ধরাপৃষ্ঠে

আসিয়া আঘাত করে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারের এইরূপ অনেক উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর নানা মিউজিয়মে সংগৃহীত আছে।

নিত্য অসংখ্য উল্কা-পতনের মধ্যে দুই একটির পতনে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা থাকে। ১৯০৮ খৃঃ সাইবিরিয়া প্রদেশে এইরূপ এক বৃহৎ উল্কাপাত ঘটে। ইহা তীব্রবেগে পতনের সময় বায়ুমণ্ডলে যে আলোড়ন তুলিয়াছিল, উহার ফলে এমন প্রচণ্ড ঝড় উঠিল যে উহার পতন স্থানের একশত বর্গ মাইলের মধ্যে একটিও গাছ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না।

১১
সূর্য্যাভিমুখে যাত্রা

আমাদের পৃথিবী যদি ছাড়াইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে কি দেখিতে পাইতাম? মাধ্যাকর্ষণবিধি অনুযায়ী সেকেণ্ডে সাত মাইল বেগে আকাশে কাহাকেও ছুড়িয়া দিতে পারিলেই হইল, আর কোন বিশেষ চেষ্টা তাহাকে করিতে হইবে না; সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণে তখন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কাটাইয়া মহাকাশে সে ছুটিতে পারিবে। সেকেণ্ডে সাত মাইল বেগে যাত্রা আরম্ভ করিলে প্রায় দশ সপ্তাহে আমরা সূর্য্যলোকে গিয়া উপস্থিত হইতে পারিব।

বায়ুমণ্ডলের উর্দ্ধে আকাশের দৃশ্য

এইরূপ যাত্রারম্ভের কয়েক সেকেণ্ড পরেই মহাকাশের দৃশ্যাবলীর অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। ক্রমশঃ আকাশের নয়নজুড়ান নীলবর্ণ মিলাইয়া গিয়া ঘনতম কৃষ্ণবর্ণ দেখা দিবে। অমানিশির ঘনতামস মহাকাশ ছাইয়া আছে দেখিতে পাওয়া যাইবে। বিরামহীন রজনীর ঘন অন্ধকারের বুকে তখন অসংখ্য নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিবে। পৃথিবী হইতে যখন এইগুলিকে দেখিতাম তখন

এইগুলি ঝিক্‌মিক্ করিত, এখন আর উহারা ঝিক্‌মিক্ করে না। এখন উহা-দিগের একটানা তীব্র জ্যোতি চক্ষে তীরের মত আসিয়া বিঁধে।

ইতিমধ্যে সূর্য্যের সোণার বর্ণ তীব্র শুভ্র জ্যোতিতে পরিণত হইয়াছে। সূর্য্যের আলোক কোন বস্তুর উপর পড়িয়া ছায়াপাত করিলে উহা দেখিতে হয় তখন ভয়ঙ্কর। প্রকৃতিতে কোথাও আর সৌন্দর্য্যের লেশ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহার মধুর কোমলতাও আর চোখে পড়ে না। কয়েক সেকেণ্ডেই আমরা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছাড়াইয়া মহাকাশের মহাশূন্যে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেই বুঝিতে পারি যে, পৃথিবীতে এই অসংখ্য রংএর খেলার প্রধান কারণ আমাদের এই ধূলি-ধোঁয়াপূর্ণ বায়ুমণ্ডল।

রংএর জন্ম

এই রংএর জন্মকথার এস্থানে একটু আভাস দিলে মন্দ হয় না। মনে কর সমুদ্রের ধারে দাঁড়াইয়া আছ; সম্মুখে বহু সারিবদ্ধ লোহার খুঁটি জলে পোঁতা আছে। ক্রমাগত ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠিতেছে, পড়িতেছে। বড় ঢেউগুলি সারিবদ্ধ খুঁটিগুলির সাম্‌নে আসিয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়া অগ্রসর হইতে থাকে; ছোট ছোট ঢেউগুলি ঐগুলিতে ঠেকিয়া নূতন পথে চারিদিকে উঠা নামা করিতে করিতে ছুটিতে আরম্ভ করে। ছোট ঢেউগুলি আসিতেছিল এক মুখে, বাধা পাইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বাধাগুলি কিন্তু বড় বড় ঢেউগুলির গতি-পথের কোন পরিবর্ত্তন আনিতে পারিল না।

মহাকাশ ভেদ করিয়া যখন সূর্য্যের রশ্মিগুলি তরঙ্গাকারে আসিয়া আমাদের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে, তখন প্রায় অনুরূপ ব্যাপার ঘটে। বায়ুমণ্ডলে সূর্য্যা-লোকের সূক্ষ্ম তরঙ্গগুলি আসিয়া অসংখ্য বাধার সম্মুখীন হয়। বায়ুমণ্ডলের বায়ু, ধূলি, ধোঁয়া ও জলের অসংখ্য কণাগুলিতে ঠেকিয়া সূর্য্যালোকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ-গুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

সূর্য্যের আলো নানা রংএর আলো মিশিয়া জন্মিয়াছে। একথা তোমরা ভাল

করিয়াই জান। প্রিজ্‌মের (Prism) মত কোন ছাঁকুনি দিয়া সূর্য্যালোক ছাঁকিয়া লইলেই উহার নানা রং ধরা পড়ে। আকাশে রামধনু উহার এই স্বরূপ প্রকাশ করে।

বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ঢেউয়েই বিভিন্ন রংএর জন্ম। লাল রং দীর্ঘ তরঙ্গের ফল এবং নীল রং ক্ষুদ্র তরঙ্গের ফল। সূর্য্যালোকের ছোট বড় নানা দৈর্ঘ্যের তরঙ্গগুলি যখন ছুটিতে ছুটিতে বায়ুমণ্ডলের অসংখ্য বাধার সম্মুখীন হয়, তখন লাল রংয়ের মত দীর্ঘ তরঙ্গগুলি বাধার সম্মুখে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া আবার অগ্রসর হইতে থাকে; কিন্তু নীলরংয়ের ক্ষুদ্র ঢেউগুলি সম্মুখস্থ বাধায় ঠেকিবামাত্র চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে বলিয়া আকাশ নীলবর্ণ বলিয়া বোধ হয়। সূর্য্যের লাল আলোক উহার সরল গতিপথে বাধা পাইয়া দ্বিধা বিভক্ত হইয়া সম্মুখদিকেই ছুটিতে ছুটিতে আমাদের চোখে আসিয়া সূর্য্যকে রাঙ্গা দেখায়। সূর্য্যের স্বরূপ কিন্তু লাল নহে, সূর্য্যালোকের নীলবর্ণ বায়ুমণ্ডলে ছাঁকিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ায় আকাশে ঘন কাল রংএর স্থানে মধুর নীল রং দেখা দেয় এবং সূর্য্যের আলোকের নীল অংশ ছড়াইয়া পড়ায় উহার লাল অংশ প্রাধান্য লাভ করে।

সকাল ও সন্ধ্যায় সূর্য্য লাল দেখায় কেন?

দিক্‌চক্রবালের উপরে বায়ুমণ্ডলের ঘন বায়ু, ধূলি, ধোঁয়া আদির জন্য বাধার আধিক্য থাকায় সূর্য্যালোকের নীলাংশের অধিকাংশ ছাঁকিয়া গিয়া ছড়াইয়া পড়ে এবং উহার মাত্র লাল অংশ আমাদের চোখে লাগে, সেইজন্য সকাল সন্ধ্যায় সূর্য্য এত রক্তবর্ণ দেখায়। কুয়াসা বা পাতলা মেঘের মধ্য দিয়া সূর্য্যকে দেখিলে এই কারণেই এত লাল দেখায়। গোধূলি তাই এত সুন্দর। আগ্নেয়গিরি প্রদেশে অগ্ন্যুৎপাতের পর আকাশ যখন গিরি-নিক্ষিপ্ত ভস্মরাশিতে ছাইয়া যায়, তখন আকাশে যে রংএর অদ্ভুত খেলা দেখিতে পাওয়া যায় উহার কারণও ঐ।

সূর্য্যের প্রকৃত রূপ

এই কারণেই বায়ুমণ্ডল ছাড়াইয়া গেলেই আকাশের অপূর্ব্ব মধুর বর্ণচ্ছটা

মিলাইয়া গিয়া রূঢ় তীব্র জ্যোতি আসিয়া চক্ষুর পীড়া উপস্থিত করে। তখন মহাকাশে মাত্র তীব্র জ্যোতি বা ঘন তামস দেখিতে পাওয়া যায়; মাঝামাঝি কিছুই চোখে পড়ে না। ক্রমশঃ সূর্য্য অভিমুখে ছুটিতে ছুটিতে উহার স্বরূপ প্রকাশ হইতে থাকে। ঘন কৃষ্ণ মহাকাশের বুকে এক সুস্পষ্ট নীলাভ জ্যোতির্ম্ময় গোলকরূপে সূর্য্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

চন্দ্র

দেখিতে দেখিতে আমরা চন্দ্রের নিকটে আসিয়া পড়িয়াছি। পৃথিবী ক্রমশঃ দূরে সরিয়া গিয়া অস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বায়ু, ধূলি, কুয়াসা, মেঘ ও স্থানে স্থানে বৃষ্টি ও বরফের ঘন আচ্ছাদনে ঢাকা বলিয়া পৃথিবীর এই অস্পষ্টতা।

পৃথিবীর তুলনায় এখন চন্দ্রের আকার অতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মত চন্দ্রের কোন বায়বীয় আবরণ না থাকায় উহার উপরে বৃষ্টি, কুয়াসা, ধূলি প্রভৃতি ভাসমান বাধা আমাদের দৃষ্টি অবরোধ করিতে পায় না; সেইজন্য উহার পৃষ্ঠদেশ খুব ভাল করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল বড় বড় দূরবীক্ষণের সাহায্যে চন্দ্রকে আমাদের দৃষ্টিপথের পাঁচ মাইলের মধ্যে আনিয়া দেখা সম্ভব।

দূর হইতেও দেখিয়া বলা চলে যে চন্দ্রে জলের অস্তিত্বও নাই। চন্দ্রে সাগর ঝিল বা নদী থাকিলে, উহাদিগের উপরে সূর্য্যের আলো পড়িয়া জ্বল জ্বল করিত। অতি শক্তিশালী দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলেও এমন কিছু চোখে পড়ে না যাহা দেখিয়া জল বলিয়া ভ্রম হওয়া সম্ভব। চন্দ্রের নিকটস্থ হইয়া বন, মাঠ বা নগর কিছুই চোখে পড়িল না।

এতদিন লোকমুখে যাহা শুনিয়া আসিয়াছি, উহার সহিত চোখে দেখা ছবির কোনই সাদৃশ্য নাই। চন্দ্রের সারা পৃষ্ঠদেশ একটা মোটামুটি সমতল অনুর্ব্বর মরুভূমি মাত্র। উহাতে কোথাও কৃষিকর্ম্ম বা কোন প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায় না। চন্দ্রের অধিকাংশ স্থানে উচ্চ গোলাকার পাড়-বেষ্টিত নিম্নভূমি দেখিতে পাওয়া গেল। এইগুলি দেখিতে অনেকাংশে বিশাল জামবাটির মত। এই

গুলিকে দেখিয়া মনে হইল যে উহারা নির্ব্বাপিত আগ্নেয়গিরির গর্ভদেশ। এই মৃত আগ্নেয়গিরিগুলির গর্ভদেশ এরূপ বড় যে আমাদের দেশের কোন কোন সম্পূর্ণ জিলার উহার মধ্যে সহজেই স্থান হইতে পারে। স্থানে স্থানে সুবৃহৎ পর্ব্বতশ্রেণী চোখে পড়িতে লাগিল। ইহাদিগের সুউচ্চ শৃঙ্গগুলির সৃষ্টি অবধি কোন পরিবর্ত্তনই
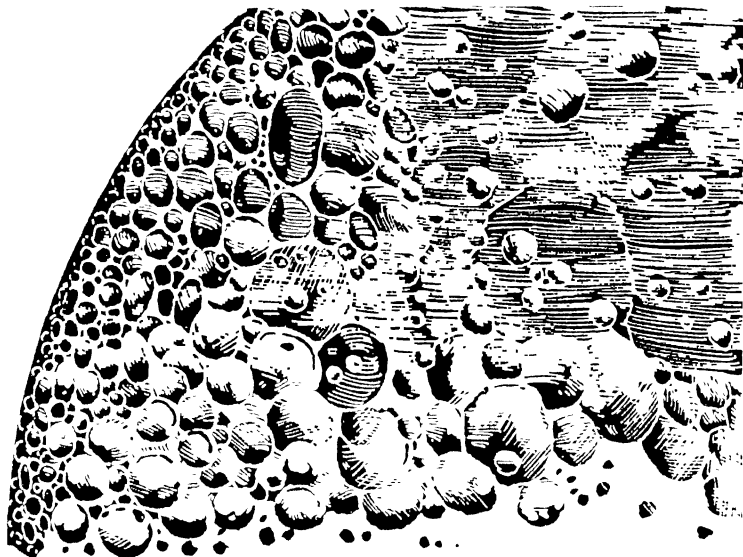
পাঁচ মাইল দূর হইতে চন্দ্রকে যেরূপ অসমতল দেখায়

ঘটে নাই। আমাদের পৃথিবীতে পর্ব্বতগুলির তুষার, বৃষ্টি ও ঝড়ের মুখে ক্ষয় সৃষ্টি অবধি লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া চলায়, উহাদিগের অসম্ভব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। চন্দ্রে জল বা বায়ু না থাকায় পর্ব্বতগুলি অজর অমর। অক্ষত পর্ব্বত চূড়াগুলির উপর সূর্য্যালোক পড়িলে যে ছায়া সমতল মরুভূমি বক্ষে গিয়া পড়ে, উহা পৃথিবী হইতেও ক্ষুদ্র দূরবীক্ষণে দেখা যায়। চন্দ্রের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত শিখরের উচ্চতা মাত্র ১৯,০০০ ফুট।

চন্দ্রপৃষ্ঠে আর একটি জিনিষ লক্ষ্য হয়। চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ মাত্র। ফলে এখানে যে বালক ৪ ফুট উচ্চ লাফাইতে পারে সে চন্দ্রে গিয়া ২৪ ফুট অনায়াসেই লাফাইতে পারিবে। এই কারণেই চন্দ্রপৃষ্ঠের পাহাড়গুলির শিখরে উঠিতে কাহারও কোন ক্লান্তি বোধ হইবে না।

পৃথিবী ও চন্দ্রের সন্ধিবেগ (Critical speed)

আমাদের সশরীরে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করিতে হইলে সেকেণ্ডে সাত মাইল বেগে যাত্রারম্ভ করিতে হইবে। যাত্রারম্ভে সেকেণ্ডে সাত মাইল অপেক্ষা মন্দবেগে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাকে আবার ধরাবক্ষে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের মত ফিরিয়া আসিতে হয়। চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অত্যন্ত অল্প বলিয়া যাত্রারম্ভে সেকেণ্ডে দেড় মাইল মাত্র বেগে কোন দ্রব্য নিক্ষিপ্ত হইলেই সে চন্দ্রের মায়া কাটাইয়া মহাকাশে ছুটিয়া বেড়াইবে। এই পৃথিবীর পক্ষে সেকেণ্ডে সাত মাইল ও চন্দ্রের পক্ষে দেড় মাইল বেগকে সন্ধিবেগ বলে।

আমাদের বায়ুমণ্ডলের অসংখ্য উপাদান নানা বেগে ছুটাছুটি করিতেছে, কিন্তু কোন উপাদানের যাত্রারম্ভ-বেগ সাত মাইল নহে, ফলে হাজার ছুটাছুটি করিলেও কেহই পৃথিবীর মায়া কাটাইয়া যাইতে পারে না। চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ক্ষীণ হওয়ায় চন্দ্রপৃষ্ঠের বায়বীয় মণ্ডলের কোন উপাদানকেই উহা ধরিয়া রাখিতে পারে নাই, ফলে উহার কোন বায়ুমণ্ডল নাই এবং উহার অভাবে জীব-বিকাশের কোন সম্ভাবনাও নাই।

চন্দ্রে দিবা ও তাপমাত্রা

চন্দ্র পৃথিবীকে প্রায় একমাসে একবার প্রদক্ষিণ করে, এবং সকল সময়েই আমরা উহার একই পার্শ্ব দেখিতে পাই। এই ব্যবস্থার ফলে চন্দ্রের যে-পৃষ্ঠ এক-বার সূর্য্যমুখী হয়, উহা এক পক্ষ ধরিয়া রৌদ্রদগ্ধ হইতে থাকে। ইহাতে ইহার পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা দুইশত ডিগ্রিও ছাড়াইয়া উঠে। এই তীব্র তাপে উহার বায়ুমণ্ডলের প্রতি অণুটি সেকেণ্ডে দেড় মাইল অপেক্ষাও অধিক বেগ লাভ করিয়া

চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব কাটাইয়া মহাকাশে মিলাইয়া গিয়া থাকিবে। চন্দ্রের যে-পৃষ্ঠ সূর্য্যের আলো এক পক্ষ ধরিয়া পায় না, উহা এত শীতল যে সেরূপ অবস্থায় কোন প্রকারে প্রাণের বিকাশ ঘটিতেই পারে না।

চন্দ্রপৃষ্ঠের আচ্ছাদন

চন্দ্রপৃষ্ঠ হইতে যে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হইয়া আমাদের নিকটে আসে, উহার বিচার করিয়া চন্দ্রপৃষ্ঠের শীত, তাপের মাত্রা ও উহার আচ্ছাদনের উপাদান জানিতে পারা গিয়াছে। পৃথিবীতে নানা উপাদানে প্রতিফলিত সূর্য্যালোকের সহিত চন্দ্রালোকের তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে উহা আগ্নেয়গিরি-উৎক্ষিপ্ত ভস্ম-রাশি হইতে প্রতিফলিত সূর্য্যালোকের মত। এই চন্দ্রালোকের বিচার-সিদ্ধান্ত অন্যান্য উপায়ে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তেরই পরিপোষক।

আর এক পথে উল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়। আগ্নেয়গিরি-উৎক্ষিপ্ত ভস্ম য়্যাস্‌বেষ্টসের (Asbestos) মত নিখুঁত তাপরোধক (non-conductor)। সারা চন্দ্রপৃষ্ঠ উল্লিখিত ভস্মে আচ্ছাদিত থাকায় একপক্ষ ধরিয়া সূর্য্যতাপে তাপিত হইয়া যখন চন্দ্রপৃষ্ঠ প্রায় ফুটন্ত জলের মত তপ্ত হইয়া উঠে, তখন কিন্তু উক্ত আগ্নেয় আচ্ছাদনের (volcanic ash) জন্য ঐ তীব্র তাপ চন্দ্রের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না।

চন্দ্রের পূর্ণগ্রহণের সময় চন্দ্রপৃষ্ঠ হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য সূর্য্যালোক হইতে বঞ্চিত হয়। দূরবীক্ষণের সাহায্যে দেখা গিয়াছে যে এই সময়ে চন্দ্রপৃষ্ঠের তাপ মাত্রা কয়েক মিনিটের মধ্যেই ১৯৪ ডিগ্রি হইতে ৩৪৬ ডিগ্রি নামিয়া যায়। আমাদের পৃথিবীতে যখন সূর্য্যের পূর্ণগ্রাসে সূর্য্যালোকের হঠাৎ অভাব ঘটে, তখন কয়েক মিনিটের মধ্যে তাপমাত্রা নামিয়া যায় বটে, কিন্তু ঐরূপ অসম্ভব নামে না। পৃথিবী মাটিতে শুষিয়া লইয়া যে সূর্য্যতাপ সঞ্চয় করে, উহাই তখন বিকীর্ণ হওয়ায় পৃথিবীর তাপমাত্রা তত নামিতে দেয় না। চন্দ্রের যে তাপমাত্রা ঐরূপ সময়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই অত অসম্ভবরূপে নামিয়া যায়, তাহার একমাত্র কারণ যে উহা সূর্য্যতাপ অতিরিক্ত পরিমাণে লাভ করিলেও আগ্নেয় ভস্মাচ্ছাদনের জন্য

ভূনিম্নে গিয়া সঞ্চিত হইতে পায় না। ফলে সূর্য্যের আলোকদান হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেলেই উহার তাপমাত্রা কয়েক মিনিটের মধ্যেই অসম্ভব নামিয়া যায়।

শুক্র

আমাদের সূর্য্যাভিমুখে যাত্রাপথে চন্দ্রের পরেই শুক্রগ্রহ পড়ে। আকারে পৃথিবীর মতই, কিন্তু দিবারাত্র ঘন মেঘে ঢাকা থাকে বলিয়া ইহার কিছুই চোখে পড়ে না।

বুধ

তাহার পরই বুধের সহিত দেখা। ইহারও চন্দ্রের দশা। চন্দ্র পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে এমন প্রচণ্ডভাবে বাঁধা যে পৃথিবীর মত পাক খাইবার শক্তিও নাই; বুধেরও ঠিক ঐরূপ অবস্থা। সূর্য্যের অতি নিকটে থাকায় সূর্য্যের প্রচণ্ড মাধ্যা-কর্ষণে এমন বাঁধা যে উহারও চন্দ্রের মত পাক খাইবার শক্তি নাই।

বুধ আকারে অতি ক্ষুদ্র। ১৬টি বুধ একত্র করিলে অনেকটা পৃথিবীর মত দেখিতে হইবে। ইহার মাধ্যাকর্ষণ চন্দ্রের মত অতি অল্প; ফলে ইহার কোন বায়ুমণ্ডল নাই। ইহার পৃষ্ঠদেশ পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। আবর্ত্তন গতির অভাবে চন্দ্রের মত ইহারও সূর্য্য-মুখী অংশের কখন পরিবর্ত্তনও ঘটে না। পৃথিবী হইতে চন্দ্রের মত ইহাকেও ফালি ফালি করিয়া বাড়িতে কমিতে দেখা যায়।

বুধের সূর্য্য-মুখী অংশ এত ভয়ঙ্কররূপে তাতে যে, ঐ গ্রহে নদী থাকিলে বোধ হয় ঐগুলি গলিত ধাতব পদার্থের। জলের মত তরল পদার্থ ঐরূপ তীব্র তাপে নিমেষে বাষ্পাকারে মহাকাশে মিলাইয়া যাইবে। বুধ হইতে প্রতিফলিত আলোক বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে উহার মৃত্তিকাও চন্দ্রের মত আগ্নেয় ভস্মে গঠিত।

সূর্য্যলোক—নিকট হইতে

সৌরপৃষ্ঠের দৃশ্য

বুধকে ছাড়াইয়া আমরা এইবার সূর্য্যের অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পৃথিবী হইতে যাত্রা করিবার সময় ইহাকে যেরূপ দেখাইত, এখন ইহা তাহার সাত গুণ বড় দেখাইতেছে। ক্রমশঃ যত ইহার নিকটস্থ হইতেছি ততই ইহার স্বরূপ দেখিতে পাইতেছি। ক্রমশঃ আরও নিকটবর্ত্তী হইলে ইহা আমাদের সম্মুখস্থ সমস্ত আকাশটুকুই জুড়িয়া আছে মনে হইতে লাগিল।

হ্যাঁ, এতদিনে ঋষিদিগের সূর্য্যস্তবের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিলাম। এইরূপ দেখিলে স্বতঃই মনে আসে

ওঁ জবাকুসুমসংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং

চাঞ্চল্য যদি জীবনের লক্ষণ হয়, সূর্য্য তাহা হইলে অসম্ভবরূপে জীবন্ত। সূর্য্যলোকে কিছুই স্থির নহে, সকল উপাদানই অসম্ভব বেগে অবিরাম ছুটাছুটি করিতেছে। এই অসম্ভব চাঞ্চল্যের ফলে সূর্য্যের ফুটন্ত পৃষ্ঠদেশে অবিরাম বিস্ফোরণ চলিতেছে।

সূর্য্যগর্ভে তেজের কারখানা

সূর্য্যের গর্ভদেশটি মনে হয় একটি বিরাট কারখানা। এই কারখানায় অবিরাম তেজ সৃষ্টি হইতেছে। এই অপরিমেয় সৃষ্ট তেজ মুক্তি পাওয়ায় সৌরপিণ্ডকে অসম্ভব তাতাইয়া তুলে। তাহার পর এই সৌরপিণ্ড হইতে মুক্ত তেজ বিশ্বে অবিরাম বিকীর্ণ হইতে থাকে।

সৌরগর্ভে প্রতি অণুটি পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তেজে পরিণত হইতেছে। এই-রূপে জড়ের ধ্বংসে যে অপরিমেয় তেজের অবিরাম জন্ম হইতেছে, উহাই হইল সূর্য্যের অফুরন্ত তেজ বিকীরণের প্রধান কারণ। সূর্য্যের বিকীর্ণ তেজের হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে সূর্য্য তাহার পৃষ্ঠদেশের প্রতি বর্গ ইঞ্চি স্থান হইতে ষোল ঘোড়ার শক্তির মত তেজ ক্রমাগত বিশ্বে বিলাইতেছে।

সৌরশিখা

অপরিমেয় শক্তির বিকাশ কেবল সৌরপৃষ্ঠের বিস্ফোরণেই শেষ হয় না। সৌরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে লক্ষ লক্ষ মাইল উচ্চ আগুণের ফোয়ারার খেলা চোখে পড়ে। এইগুলিকে সৌরশিখা বলে। সৌরশিখার গগনচুম্বী শত শত জিহ্বা লক্‌লক্ করিয়া যখন পূর্ণগ্রাসের ঘনকৃষ্ণ আকাশের গায়ে হঠাৎ জ্বলিয়া উঠে, তখন যুগপৎ বিস্ময়ে ও ভয়ে মানুষের মন অভিভূত হইয়া পড়ে। সূর্য্য-গর্ভের অফুরন্ত শক্তি এইরূপ নানা পথে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯১৯ খৃঃ পূর্ণগ্রাসের সময় এইরূপ একটি বিশাল সৌরশিখার আলোক-চিত্র গ্রহণ করা হয়। ইহাকে পৃথিবী হইতে একটি বিরাট পিপীলিকাভুকের মত দেখাইতেছিল। এই তেজোময় বিশাল পিপীলিকাভুক্‌টী আমাদের পৃথিবীকে একটি ক্ষুদ্র ডিমের মতই গিলিয়া ফেলিতে পারে। আলোকটিকে প্রথমে দেখা গেল দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩৫০,০০০ মাইল, এবং কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ যেন ইহা এক উল্লম্ফনে ৪৭৫,০০০ মাইল দীর্ঘ হইয়া উঠিল। এই অদ্ভুত দৃশ্যের পরে সূর্য্য অস্ত যাওয়ায় আর কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না।

সৌরশিখা ব্যতীত পৃথিবী হইতে সৌরপৃষ্ঠে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ ক্ষত দেখিতে পাই। এইগুলিকে সৌরকলঙ্ক বলিয়া জানিতাম। নিকটে গিয়া দেখা যায় যে ঐগুলি মোটেই কৃষ্ণবর্ণ নহে এবং কলঙ্কও নহে। ঐগুলি সৌরপৃষ্ঠে এক একটি বিশ্বগ্রাসী ফাটল। আমাদের পৃথিবী ঐরূপ একটির মধ্যে টুপ করিয়া পড়িয়া গেলে জানিতেই পারা যাইবে না।

ক্রমশঃ আমরা সূর্য্যের অগ্নিময় বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করিলাম। এখন আমাদের চারিদিকেই আগুনের লেলিহান জিহ্বাগুলি আমাদের সর্ব্বাঙ্গ লেহন করিতে লাগিল। এ যেন সহস্রমুখী আগুনের ফোয়ারায় স্নান করিতে নামিয়াছি। সূর্য্য-গর্ভের অপরিমেয় তেজে সকল পদার্থই বাষ্পীভূত হইয়া সূর্য্যের বায়ুমণ্ডল গড়িয়া তুলিয়াছে। এই তথ্য পূর্ব্ব হইতেই পৃথিবীতে বর্ণছত্রমান (spectroscope) সাহায্যে জানিতাম।

১৩

সূর্য্যগর্ভে

প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে অগ্নিময় বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া আমাদের ধরা-পৃষ্ঠের মত কঠিন ভূমি সূর্য্যপৃষ্ঠে পাইব ; কিন্তু যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই তীব্র তপ্ত জ্বলন্ত গ্যাস ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। জলচর যেমন সমুদ্রে যতই প্রবেশ করে, ততই জল ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না, ঠিক সেইরূপ আমরা সূর্য্যগর্ভে যতই প্রবেশ করিতে লাগিলাম, ততই তীব্র তপ্ত জ্বলন্ত গ্যাসের ঝটিকাবর্ত্ত ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। একমাত্র প্রভেদ যে যতই কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই তাপমাত্রা বাড়িতে লাগিল।

পৃথিবীতে ও অন্যান্য গ্রহে বায়বীয় আচ্ছাদনের পর কঠিন ভূমি পাওয়া যায়, তেজোময় সূর্য্যে বা নক্ষত্রগুলিতে কাঠিন্যের কোন বালাই নাই। মহাশূন্য হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সূর্য্য বা নক্ষত্রের উপাদানের বায়বীয় মহাসাগরে প্রবেশ করিবার সময় যতই উহার কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইতে থাকা যায়, ততই উহার ঘনত্ব ও তাপমাত্রা বাড়ে বটে, কিন্তু আর কোন পরিবর্ত্তনই লক্ষ্য হয় না।

সূর্য্যগর্ভে আনুমানিক তাপমাত্রা

সৌরশিখার তাপমাত্রা ছিল সাত আট হাজার ডিগ্রি, সৌর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করিলে উহা ক্রমশঃ গিয়া উঠিল প্রায় দশ হাজার ডিগ্রি। সূর্য্যের এই জ্বলন্ত বায়ুমণ্ডল হইতে আগুনের অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া আমরা শেষ আমাদের জন্মভূমি পৃথিবীকে দেখিয়া লইলাম। তাহার পর সূর্য্যের গর্ভদেশে ডুব দিলাম। তখন অপরিমেয় আগুনের দুর্দ্দান্ত খেলা আমাদিগের চারিদিকে। তখন হইতে তাপমাত্রা দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিল এবং সৌরকেন্দ্রে গিয়া দাঁড়াইল প্রায় ৪ কোটি ডিগ্রি। উঃ! মধুর শীতল পৃথিবী হইতে এই প্রচণ্ড তাপ কল্পনা করা যায় না। পৃথিবীতে জল ফোটে ১০০° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডে, সিসা ফোটে ৩২৫ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডে, তামা ফোটে ১০৮৩° সেণ্টিগ্রেডে, লোহা ফোটে ১৫৩৩° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডে ; লক্ষ লক্ষ ডিগ্রি তাপমাত্রার ধারণা কিরূপে এখানে সম্ভব ?

সূর্য্য ক্রমশঃ আকারে কমিতেছে

আমাদের পৃথিবীর উপরিস্থ বায়ুমণ্ডলের চাপ (ভার) প্রতি বর্গ ইঞ্চির উপর প্রায় পনর পাউণ্ড (এক পাউণ্ড প্রায় অর্দ্ধ সের)। আজকালের যে ইঞ্জিন এক সারি গাড়ী লইয়া ঝড়ের মত ছুটে, উহার বাষ্পাধারের ভিতরের চাপ বায়ুমণ্ডলের প্রায় বিশগুণ, কিন্তু সূর্য্যের কেন্দ্রে উহার উপরিস্থ সর্ব্বগ্রাসী আগ্নেয় গ্যাসের চাপ আমাদের বায়ুমণ্ডলের প্রায় চারি হাজার কোটিগুণ। সৌরগর্ভের এই বিশাল চাপে সৌর জগতের বায়বীয় উপাদান ঘনীভূত হইবার কথা ; পুনরায় অপরদিকে উহার অপরিমেয় তাপ ঐ বায়বীয় উপাদানকে কল্পনাতীত ভাবে তাতাইয়া ফুলাইবার চেষ্টা করে। এইরূপে সৌরগর্ভে একটা বিরাট সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচনের দ্বন্দ্ব মধ্যে পড়িয়া সৌর উপাদানের "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থা ঘটে। শেষে কিন্তু চাপেরই জয় ঘটে এবং সূর্য্য যে অবিরাম তিলে তিলে ঘনীভূত হইতেছে উহার চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

প্রচণ্ড তাপে পরমাণুগুলির মুক্তি

তাপমাত্রা কয়েক হাজার ডিগ্রি উঠিলেই, আমাদের জানা সকল উপাদানই বায়বীয় আকার গ্রহণ করে। এইরূপে কোন দ্রব্য কঠিন হইতে তরল হয়, তাহার পর তরল হইতে বায়বীয় রূপ ধারণ করে এবং শেষে ঐরূপ প্রচণ্ড তাপে উক্ত দ্রব্যের অণুগুলির আসক্তি (valency) শিথিল হওয়ায় উহার পরমাণুগুলি মুক্তি পায়। পৃথিবীতে বর্ণচ্ছত্রমানে (spectroscope) সৌরালোক পরীক্ষা করিলেই এ বিষয় ধরা পড়ে। এখানে আসিয়া প্রথমেই লক্ষ্য হয় যে সৌরপৃষ্ঠে পরমাণুগুলি আসক্তিহীন সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থায় মনের আনন্দে মাতামাতি করিয়া বেড়াইতেছে। অতি তপ্ত নক্ষত্রগুলির আলোক পরীক্ষা করিয়া ধরা পড়িয়াছে যে ঐ সকল স্থানের প্রচণ্ড তাপে নানা প্রকার পরমাণুগুলিও ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে।

পরমাণুর স্বরূপ

তোমরা **অদ্ভুত কথায়** (পৃঃ ১০২) পড়িয়াছ, প্রতি পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে এক নিষ্ক্রীয় গুরু পদার্থ বীজ এবং পুরুষকে বেড়িয়া প্রকৃতির লীলার মত উহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া একাধিক সক্রীয় লঘু পদার্থ বীজ অবিরাম মাতামাতি করে। ইহারা যেমনই মাতামাতি করুক না কেন, নিষ্ক্রীয় বীজের আসক্তিতে এমনই বাঁধা থাকে যে কেহই সহজে উহার আসক্তি কাটাইয়া ছুটিয়া পলাইতে পারে না। সৌরগর্ভের অপরিমেয় তাপে অধিকাংশ পরমাণুর কেন্দ্রস্থ গুরু পদার্থ বীজের আসক্তি এমনই শিথিল হইয়া পড়ে যে, উহাদিগের অধিকাংশ লঘু সাথীগুলি মুক্তি পাইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে আনন্দের মেলায় মাতামাতি করিতে করিতে উহাদিগের গণ্ডী কাটাইয়া বাহির হইয়া পড়ে। ফলে সৌরগর্ভের কেন্দ্রে থাকে নিষ্ক্রীয় গুরু বীজগুলি ও তাহাদিগের অবশিষ্ঠ লঘু সাথীগুলি। এইগুলি প্রচণ্ড তাপের মায়া কাটাইতে না পারিয়া স্ব স্ব গণ্ডীর মধ্যে এমন ভীষণ বেগে দাপাদাপি করিতে থাকে যে, উহাতে সূর্য্যকেন্দ্রের তাপমাত্রা বাড়িয়াই চলে।

১৪

কালস্রোতে যাত্রা

কাল নিজে অব্যক্ত, কিন্তু উহা ব্যক্ত পদার্থের পরিমাণ করে। ঘটনার জন্ম হওয়ায় কালের জন্ম হইল। একাধিক ঘটনার ব্যবধান পরিমাণ করিতে গিয়াই কাল জন্মিল।

তিনশত কোটি বৎসর পূর্ব্বে

বর্ত্তমানকালের মানদণ্ডে তিনশত কোটি বৎসর অতীতে কেহ আমাদের স্র্য্যের নিকটে মহাকাশে বিচরণ করিলে কি দেখিত? বর্ত্তমানের বৎসর তখন জন্মে নাই, কারণ তখনও পৃথিবীর জন্ম হয় নাই। পৃথিবী স্র্য্যকে একবার সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করিলে তবে বৎসর জন্মে; কিন্তু তখনও পৃথিবীর জন্ম হয় নাই,—বৎসর জন্মিবে কোথা হইতে?

তখনও স্র্য্যের আকার প্রায় বর্ত্তমানের মতই ছিল এবং তখন সে একমনে আপন গন্তব্য পথে কোন এক অজ্ঞাত পিণ্ডের আকর্ষণে ছুটিয়া চলিতেছিল। তিনশত কোটি বৎসর অতিবাহিত হইলেও আকারে, জ্যোতিতে বা তেজে ইহার বিশেষ কোন তারতম্য ঘটে নাই। একদিনে মানবশিশুর যেমন কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য হয় না, প্রায় সেইরূপই আমাদের তিনশত কোটি বৎসরে স্র্য্যের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য হয় না।

কিন্তু ইতিমধ্যে স্র্য্যের চারিদিকের মহাকাশের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। মানুষের আয়ুষ্কালে মহাকাশে ভ্রাম্যমান নক্ষত্রমণ্ডলীর পারস্পারিক ব্যবধানের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য হয় না বটে, কিন্তু আকাশ-বুড়ি তাহার জ্বলন্ত নুড়িগুলি লইয়া আনমনে খেলিতে খেলিতে তিনশত কোটি বৎসরে এমন পরিবর্ত্তন আনিয়াছেন যে, পূর্ব্বের মহাকাশ যে দেখিয়াছে, সে আর এখন উহা কিছুতেই চিনিতে পারিবে না।

কালস্রোতে কোটি কোটি বৎসর ভাসিয়া চলিতে চলিতে আকাশ-ছকের জ্বলন্ত মুড়িগুলির পারস্পারিক স্থানেরও একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য হইতে থাকে। নক্ষত্রগুচ্ছের আকারের ও নক্ষত্রের জ্যোতিরও বিশেষ একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য হয়। যে-নক্ষত্র পূর্ব্বে উজ্জ্বল দেখাইত, উহা সুদীর্ঘ কালের স্রোতে বহুদূর সরিয়া যাওয়ায় ম্লান দেখাইতেছে। এখন মহাকাশে নক্ষত্রগুলির মধ্যে লুব্ধকের (Sirius) মত কোনটি উজ্জ্বল দেখায় না। মহাকাশের অন্যান্য নক্ষত্রের তুলনায় ইহা আমাদের অতি নিকটে থাকায় ইহার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ; কিন্তু সুদীর্ঘ অতীতে ইহার দীপ্তিও সূর্য্যের নিকটে আগন্তুক অন্য একটি নক্ষত্রের অত্যুজ্জ্বল দীপ্তির নিকট সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ দেখাইয়াছিল।

অন্য এক নক্ষত্র আসিয়া উপস্থিত হইল

সে প্রায় দুই তিনশত কোটি বৎসর অতীতের কথা। সূর্য্যের নিকটে কেহ থাকিলে দেখিতে পাইত যে ক্রমশঃ মহাকাশের একটী নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য বাড়িতে বাড়িতে উহার প্রভায় দিঙ্‌মণ্ডল ছাইয়া ফেলিল। ইহার অত্যুগ্র দীপ্তির নিকট মহাকাশের অন্যান্য নক্ষত্রগুলি ক্রমশঃ অতিশয় ম্লান হইয়া মহাকাশের গর্ভে মিলাইয়া গেল। আরে ! এ যে ছুটিতে ছুটিতে একেবারে প্রায় সূর্য্যের ঘাড়ে আসিয়া পড়িল !

সুদূর অতীতে ইহা ছিল মহাকাশের এক কোণে এক বিন্দু আলোর মত। আপন মনে নিজের পথে এক অজানা আকর্ষণে সুদীর্ঘ কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া পড়িল আমাদের এই কিশোর সূর্য্যের নিকট। ক্রমশঃ মহাকাশে সূর্য্যের সান্নিধ্য হেতু উহার আকার বাড়িয়া বাড়িয়া একটি বৃহৎ উজ্জ্বল থালির মত দেখাইতে লাগিল। ক্রমশঃ আগন্তুক নক্ষত্রের সান্নিধ্য হেতু উহা সূর্য্যের উপরও প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

নূতন নক্ষত্রের সান্নিধ্যের ফল

চন্দ্র পৃথিবীর সান্নিধ্য লাভ করিয়া যেমন নিজের মাধ্যাকর্ষণে উহার সাগরের

জল কাঁপাইয়া তোলে, ঐ নক্ষত্রটিও অনুরূপ উপায়ে সূর্য্যের জ্বলন্ত বায়বীয় অঙ্গ কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল। পৃথিবীর তুলনায় চন্দ্রের আকার ক্ষুদ্র, উহার মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবও অল্প; সেইজন্য সাগরের জলও ফুলিয়া উঠে অল্পই। কিন্তু আগন্তুক নক্ষত্রের আকার সূর্য্যের তুলনায় অতি বিশাল, ফলে উহার মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবও অতি প্রচণ্ড। এই প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণে সূর্য্যের জ্বলন্ত বায়বীয় দেহ অতি মাত্রায় ফুলিয়া উঠায় উহাতে সুবিশাল তরঙ্গ উঠিতে লাগিল।

এইরূপে যতই নক্ষত্রটি সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই সূর্য্যের দেহ ফুলিতে ফুলিতে পর্ব্বতাকার ধারণ করিল। নক্ষত্রের মাধ্যাকর্ষণে ক্রমশঃ এই পর্ব্বতের চূড়া হইল সহস্র সহস্র মাইল উচ্চ, এবং নক্ষত্রের গতিপথের অনুসরণে উল্লিখিত বায়বীয় পর্ব্বতটি সূর্য্যের উপর ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ উক্ত পর্ব্বতের উপর যতদিন নক্ষত্রের অপেক্ষা প্রবল ছিল, ততদিন সূর্য্যাঙ্গ পর্ব্বতাকারে ফুলিয়া উঠিলেও সূর্য্যের উপরেই ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার পর নক্ষত্রটি সূর্য্যের এত নিকটবর্ত্তী হইল যে, উহার প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণের মুখে সূর্য্য আর আপন স্ফীত অঙ্গ ধরিয়া রাখিতে পারিল না। প্রথমে পর্ব্বতের চূড়া ছিঁড়িয়া নক্ষত্রের দিকে ছুটিল। ইহার ফলে পর্ব্বতের নিম্নাংশের উপর চাপ বা ভার কমিয়া গেল। নক্ষত্রের বিপরীত আকর্ষণ সত্ত্বেও স্ফীত পর্ব্বতটি আপন ভারের চাপেই এতদিন ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হয় নাই। এইবারে চূড়াটি ছিঁড়িয়া পড়ায় ভারের চাপ কমিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রের প্রচণ্ড আকর্ষণে কয়েকটি টুক্‌রা ছিঁড়িয়া পড়িল।

নক্ষত্রটি আপন গতিপথে ছুটিতে ছুটিতে আরও সূর্য্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে ঐ ছিন্ন পর্ব্বতের চূড়াটি ক্রমে গিয়া নক্ষত্রের সহিত মিলিত হইত এবং অন্যান্য ছিন্ন টুক্‌রাগুলি মিলিয়া সূর্য্য ও নক্ষত্রের মাঝে এক সেতু রচনা করিত। তাহার পর এইরূপে যুগ্ম নক্ষত্র দু'টি ডাম্বেলের (Dumb-bell) আকারে মহাকাশে ছুটিয়া বেড়াইত।

নূতন নক্ষত্রটি দূরে সরিয়া গেল

কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল আগন্তুক নক্ষত্রটির গতিপথ সোজা সূর্য্যের দিকে না গিয়া বোধ হয় এক অধিবৃত্তের (Parabola) পথে বাঁক লইল। দুর্ভাগ্যক্রমে সূর্য্য ও নক্ষত্রের যুগলমিলন আর ঘটিয়া উঠিল না। ক্রমশঃ ওই উৎপাতরূপে আগত নক্ষত্রটি সুদূর মহাকাশের গর্ভে মিলাইয়া গেল। যাইবার সময় সূর্য্যের অঙ্গ হইতে ফোস্কার মত সামান্য অংশ ছিঁড়িয়া লইয়া আকাশে উড়াইয়া দেওয়া ছাড়া ইহা আর কোন উৎপাত করিতে পারিল না। সূর্য্য ও নক্ষত্রের দোটানার মধ্যে পড়িয়া সূর্য্যাঙ্গের এই জ্বলন্ত ফোস্কা সম্পূর্ণরূপে ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইবার পূর্ব্বে দুইমুখ সূচাল সিগারের আকার ধারণ করিল। (পূর্ব্বের পৃঃ ১৪-১৬ দেখ)

সূর্য্যের জ্বলন্ত এক ফোস্কা হইতে নবগ্রহের জন্ম

বর্ত্তমানে যে গ্রহটি সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরে থাকিয়া উহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, উহাই ছিল এই বিশাল পর্ব্বতাকার ফোস্কার চূড়া। সূর্য্য হইতে সম্পূর্ণরূপে ছিঁড়িয়া পড়িবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সুবিশাল জ্বলন্ত সিগারটির যে ক্ষীণতম বন্ধনটি বজায় ছিল, উহা হইতেই বর্ত্তমান বুধ জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

তাহার পর ক্রমশঃ বিশালকায় সিগারটি আপন ও সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে কোটি কোটি বৎসরে কয়েকটি টুক্‌রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া পাক খাইতে খাইতে বর্ত্তুলাকার ধারণ করিতে লাগিল। কালে এইগুলি মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে উপবৃত্তাকারে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ক্রমশঃ বর্ত্তমানে প্রায় চক্রাকার পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

এই সূর্য্যাঙ্গের ফোস্কার একাংশ হইতে আমাদের জন্মভূমি পৃথিবীর জন্ম হইয়াছে। সূর্য্যের ফোস্কা ভাঙ্গিয়া কেবলমাত্র কতকগুলি গ্রহ উপগ্রহ জন্মিল না; সেই সঙ্গে উহাদিগের প্রদক্ষিণ পথে উক্ত ফোস্কারই রাশি রাশি ছোট ছোট টুক্‌রা ঝরিয়া পড়িয়া পথগুলিকে আবর্জ্জনাপূর্ণ করিয়া বাধাময় করিয়া তুলিল। এই রাশি রাশি আবর্জ্জনা ঠেলিয়া গ্রহগুলিকে কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া চলিতে হওয়ার ফলে বিস্তৃত উপবৃত্তাকার পথ গুটাইয়া বর্ত্তমানে প্রায় চক্রাকারে দাঁড়াইয়াছে।

মাধ্যাকর্ষণ

দুইশত কোটি বৎসর অতীতে আগন্তুক এক বিপুলকায় নক্ষত্রের দৈবাৎ সান্নিধ্য লাভ করায় যে-শক্তির বশে আমাদের সূর্য্যের বুকে সহস্র সহস্র মাইল উচ্চ পর্ব্বতাকার তরঙ্গ উঠিয়া সৌরমণ্ডলের গ্রহ উপগ্রহাদির জন্ম হয় এবং আমাদের মত জীবের ধরাবক্ষে জন্মগ্রহণ করা সম্ভবপর হয়, যে-শক্তির বাঁধনে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু পরমাণুটি বাঁধা,—সেই শক্তির একটু বিস্তৃত আলোচনা হওয়া দরকার।

দশমণ ভারি কোন বস্তু সাধারণতঃ কেহই তুলিতে পারে না। কেন? পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এই বস্তুটিকে অবিরাম স্বকেন্দ্রের দিকে টানিতে থাকায় উহাকে তুলিতে পারা যায় না।

সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণে পৃথিবীর কক্ষ উপবৃত্তাকার

একটি বলকে উচ্চে ছুঁড়িয়া দিলে উহা কিছু উপরে উঠিয়াই পুনরায় পৃথিবীর দিকে বেগে নামিতে আরম্ভ করে। বলটিকে প্রথমে বোধ হয় ঘণ্টায় দশ মাইল বেগে ছুঁড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। পৃথিবী উহাকে স্বকেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ না করিলে উহা পৃথিবী ছাড়াইয়া চলিয়া যাইত। চন্দ্র আকাশে ঘণ্টায় প্রায় ২৩০০ মাইল বেগে ছুটিতেছে। পৃথিবী স্বকেন্দ্রাভিমুখে উহাকে না টানিলে উহা সোজা পথে ছুটিয়া একবৎসরে প্রায় দুই কোটি মাইল দূরে মহাকাশে চলিয়া যাইত। পৃথিবীর টানে ইহার গতিপথ সরল না হইয়া ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে বাঁকিয়া বাঁকিয়া পড়িতেছে। ফলে ইহা প্রায় চক্রাকার পথে পৃথিবীকে অবিরাম প্রদক্ষিণ করিতেছে।

গতিপথে চন্দ্রের ধরাভিমুখে অবিরাম বাঁকিয়া পড়ার একমাত্র কারণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ। এই তথ্য ইয়োরোপে সর্ব্বপ্রথম ধরা পড়ে স্যার আইজাক্ নিউটনের (Sir Isaac Newton) তীক্ষ্ণ বুদ্ধির নিকট। জনপ্রবাদ যে, তাঁহার বাগানের গাছ হইতে একটি ফলকে মাটিতে পড়িতে দেখিয়া পৃথিবীর আকর্ষণের বিষয় তাঁহার মনে উদয় হয়।

মাধ্যাকর্ষণের প্রথম সূত্র

তাঁহার আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণ বিধি অনুযায়ী এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি বস্তুটি অন্যান্য সকল বস্তুকে, উহা যত দূরেই থাকুক না কেন, অবিরাম আপন দিকে টানিতেছে। এই আকর্ষণের তীব্রতা নির্ভর করে বস্তুর উপাদানসমষ্টির উপর। ধরাবক্ষের প্রতি বস্তুটি বিপুলকায় পৃথিবীর তুলনায় এত ক্ষুদ্র যে, উহাদিগের পরস্পরের প্রতি বা পৃথিবীর প্রতি আকর্ষণের প্রভাব মোটেই টের পাওয়া যায় না ; অন্যদিকে উহাদিগের উপর বিপুলকায় পৃথিবীর আকর্ষণের প্রভাবই সর্ব্বদা লক্ষিত হয়।

মাধ্যাকর্ষণের দ্বিতীয় সূত্র

একটি বস্তু যতখানি শক্তিতে অন্য একটি বস্তুকে আকর্ষণ করে, দ্বিতীয় বস্তুটি ঠিক ততখানি শক্তিতেই প্রথম বস্তুকে আকর্ষণ করে। গাছের ফল যখন মাটিতে পড়ে, তখন ফলটি যত জোরে পৃথিবীকে আকর্ষণ করে, পৃথিবী ঠিক তত জোরেই ফলটিকে আকর্ষণ করে। ফলের তুলনায় পৃথিবী এত বিপুলকায় যে ফলটি যতখানি শক্তিতে পৃথিবীকে আকর্ষণ করে উহাতে কোন কাজই হয় না ; অন্যদিকে পৃথিবী সেই শক্তিই প্রয়োগ করিয়া ক্ষুদ্র ফলটি আপন বক্ষে টানিয়া লয়।

মাধ্যাকর্ষণের তৃতীয় সূত্র

দুইটি বস্তুর মাধ্যাকর্ষণ নির্ভর করে উহাদিগের উপাদানসমষ্টির উপর, উপাদানের প্রকৃতির উপর নহে। এক মণ জল যে শক্তিতে অন্যবস্তুকে টানে, ঠিক সেইটুকু শক্তি দিয়াই এক মণ তুলা বা এক মণ লোহা অন্য বস্তুকে টানিয়া থাকে।

দুই মণ বস্তুকে দুই মণ শক্তি দিয়া পৃথিবী টানে এবং ঐ বস্তুটি দুই মণ শক্তিতে পৃথিবীকেও টানে। বিপুলকায় পৃথিবীকে দুই মণ টানে বস্তুটি কিছুই করিতে পারে না; কিন্তু পৃথিবীর দুই মণ টানে বস্তুটি পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে ক্রমবর্দ্ধমান বেগে আকৃষ্ট হয়।

মাধ্যাকর্ষণের চতুর্থ সূত্র

দুইটি বস্তুর মধ্যস্থ ব্যবধান বৃদ্ধি করিলে দেখা যায় যে মাধ্যাকর্ষণের শক্তি ব্যবধানের বৃদ্ধির অনুপাতে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। দুইটি বস্তুর ব্যবধানের সহিত উহাদিগের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্কের সূত্র আমরা জানি। এই সূত্রানুযায়ী এক টন ভার ও পৃথিবীর ভারদ্বয়ের পরস্পরের প্রতি মাধ্যাকর্ষণ সাবধানে বিচার করিয়া পৃথিবীর ওজন পাওয়া গিয়াছে ৬,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ টন মাত্র।

১৬
সূর্য্যের ভার

এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত দূরেই কোন বস্তু থাকুক না কেন উহা ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণুকে আপন কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করিবে। নিউটনের বিখ্যাত ফলটির স্থানচ্যুতিতে বিশ্বের প্রতি অণুটিতে টান পড়িয়া থাকিবে; সেরূপ কোন অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র থাকিলে উহাদিগের কম্পনে ঐ টান নিশ্চয় ধরা পড়িত। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণুটিকে না কাঁপাইয়া আমরা একটি অঙ্গুলিও নাড়িতে পারি না।

মাধ্যাকর্ষণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অনুশাসন। এই অনুশাসন বলেই সূর্য্য তাহার মণ্ডলীর বৃহস্পতির মত বিশালকায় পিণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রতি পরমাণুটির বেগ বা গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করে। মাধ্যাকর্ষণের অনুশাসন এমনই দৃঢ় ও অপরিবর্ত্তনীয় যে বহু পূর্ব্ব হইতেই সূর্য্যমণ্ডলের প্রতি পিণ্ডটির স্থান ও গতিপথ হিসাব করিয়া বলিয়া দিতে পারা যায়। এই কারণেই পূর্ব্ব হইতেই সূর্য্যগ্রহণ বা দৈনিক জোয়ার ভাঁটার তীব্রতা মানুষ জানিতে পারে।

চন্দ্রের প্রতি পৃথিবীর আকর্ষণের তীব্রতা হিসাব করিয়া পৃথিবী-পিণ্ডের ভার পাওয়া যায়। ঠিক্ এই ভাবেই পৃথিবীর প্রতি সূর্য্যের আকর্ষণের তীব্রতা হিসাব করিয়া সূর্য্য-পিণ্ডের ভার পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপে জানিতে পারা গিয়াছে যে সূর্য্য পৃথিবীর তুলনায় ৩৩২,০০০ গুণ ভারি। পৃথিবীর পিণ্ডের প্রতি ছটাক উপাদানের স্থানে সূর্য্যপিণ্ডে প্রায় ৫১৯ মণ উপাদান আছে।

সূর্য্যের এইরূপ বিশাল ভারের জন্য উহার আকর্ষণও অতি প্রচণ্ড। ফলে হঠাৎ কেহ যদি সৌর পৃষ্ঠে গিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে অতি কষ্টে সাড়ে তিন সের মাত্র ভার তুলিতে পারিবে এবং ঢিল ছুঁড়িলে উহা তিন চারি হাতের বেশী দূরে যাইবে না। সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলকর ব্যাপার—মানুষ তথায় গিয়া সূর্য্যপিণ্ডের প্রচণ্ড আকর্ষণে নিজেই এত ভারি হইয়া উঠিবে যে নিজের বিশাল ভারে আপনি চাপা পড়িয়া মারা যাইবে।

১৭

গ্রহের ধৃত উপগ্রহ

সূর্য্যের এই প্রচণ্ড আকর্ষণের ফলে উহার পরিবারস্থ কেহই আপন ইচ্ছামত পলাইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সূর্য্যের মত সৌরমণ্ডলের প্রতি অণুপরমাণুটি আপন আপন উপাদান সমষ্টির অনুপাতে প্রতি অণুপরমাণুটীকে আকর্ষণ করে। এই অনুশাসনের ফলে অতিকায় বৃহস্পতির নিকট দিয়া কোন দুঃসাহসী পিণ্ড যাতায়াত করিলেই উহাকে বৃহস্পতি টানিয়া লইয়া আপন গণ্ডিবদ্ধ করিয়া লয়। তখন ঐ পিণ্ড আপনার আদি পথ ছাড়িয়া বৃহস্পতি কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত নূতন পথে ছুটিতে আরম্ভ করে।

বৃহস্পতির প্রথম ছয়টী উপগ্রহ যে-তলে (Plane) বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করে, শেষ দুইটীকে এই পথের ঠিক লম্বভাবে প্রদক্ষিণ করিতে দেখা যায়। আটটী

উপগ্রহই যদি উহার অঙ্গজাত হইত তাহা হইলে সকলগুলিই একই দিকে—পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে—বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করিত। কিন্তু শেষ দুইটী উপগ্রহ ইহাকে উত্তর দক্ষিণে প্রদক্ষিণ করে। এই ব্যাপার দেখিয়া কেহ কেহ বলেন যে এই দুইটী উপগ্রহ বৃহস্পতির অঙ্গজাত নহে ; বোধ হয় দুইটী অণু-গ্রহ (Asteroid) আপন পথে ছুটিতে ছুটিতে দৈবাৎ বৃহস্পতির অতি নিকটে গিয়া পড়ায় উহার গণ্ডিবদ্ধ হইয়া দুইটী উপগ্রহে পরিণত হইয়া থাকিবে।
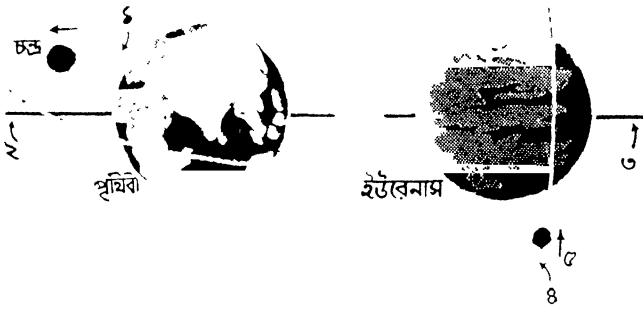
১। চন্দ্রের কক্ষ ২। পৃথিবীর কক্ষ ৩। উরণাসের কক্ষ
৪। উরণাসের উপগ্রহের কক্ষ ৫। উরণাসের উপগ্রহ

শনির শেষ উপগ্রহটী ও নেপচুনের একমাত্র উপগ্রহটীর গতিপথ ঐ প্রকার। ইহাদিগকে দেখিয়া মনে হয়, ঐগুলি ঐ গ্রহদ্বয়ের অঙ্গজাত নহে, অন্য কোন স্থান হইতে আগত। উল্লিখিত উপায়ে ধরা পড়িয়া উহারা উপগ্রহে পরিণত হইয়া থাকিবে।

১৮

শেষ দুইটি গ্রহের আবিষ্কার

শতবর্ষ পূর্ব্বে উরেনাসকেই পণ্ডিতগণ সৌরমণ্ডলের শেষ গ্রহ মনে করিতেন। জ্যোতিষীগণ সূর্য্যের ও জানা গ্রহগুলির মাধ্যাকর্ষণের হিসাব করিয়া উহার কক্ষটী স্থির করেন; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেল উহার হিসাব-করা পথে উহা ঠিক-মত সকল সময় চলে না। ইহাতে তাঁহাদের সন্দেহ হইল যে, আর কোন গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ বোধ হয় উহার এইরূপ কক্ষভ্রষ্ট হওয়ার কারণ।

নেপচুন

দুইটি তরুণ গণিতজ্ঞ—একজন কেম্ব্রিজের জে. সি. এডামস্ (J. C. Adams) নামক ইংরাজ, অন্যজন প্যারিসের ইউ. জে. জে. লেভেরিয়র (U. J. J. Leverrier) নামক ফরাসী—উরেনাসের এইরূপ কক্ষ-বিচ্যুতির কারণ যেরূপ-গ্রহের মাধ্যাকর্ষণে হওয়া সম্ভব, সেইরূপ একটী গ্রহের অস্তিত্ব ধরিয়া লইয়া উহার আকার, কক্ষ, ওজন ইত্যাদি কষিয়া বাহির করিলেন। কোন এক বিশেষ দিনে ঐরূপ অজানা গ্রহটির আকাশের কোথায় থাকা উচিত তাহাও কষিয়া বাহির করা হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় সেই নির্দ্দিষ্ট দিনে আকাশের ঐ নির্দ্দিষ্ট কোণে দূরবীক্ষণ দিয়া লক্ষ্য করিবামাত্র ঐরূপ একটী গ্রহ দেখিতে পাওয়া গেল। এই গ্রহটী বর্ত্তমানে নেপচুন নামে খ্যাত।

প্লুটো

নেপচুনের মাধ্যাকর্ষণ ধরিয়াও উরেনাসের কষা পথের সহিত চলা পথের ঠিক মিল পাওয়া গেল না। কিছুদিন পূর্ব্বে এই অমিল ধরা পড়ায় আবার গণিতজ্ঞেরা এক অজানা গ্রহের অস্তিত্ব ধরিয়া লইয়া হিসাব করিতে বসিয়া গেলেন। অধ্যাপক

পারসিভ্যাল লোয়েল (Parcival Lowell) নামক একজন আমেরিকাবাসী হিসাব কষিয়া বলিয়া দিলেন কোন্ দিন কোথায় ঐরূপ একটা গ্রহকে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

লোয়েল সাহেবের মৃত্যুর পরে পনর বৎসর অনুসন্ধানের ফলে ১৯৩০ সালের মার্চ্চ মাসে তাঁহার কষা পথের নিকটেই একটা গ্রহকে ছুটিতে দেখা গেল। এই শেষ গ্রহটার নাম দেওয়া হইল প্লুটো।

আমাদের পৃথিবী সূর্য্য হইতে যতদূরে, তাহার ৪০ গুণ দূরে থাকিয়া প্লুটো আমাদের সূর্য্যকে দুইশত পঞ্চাশ বৎসরে একবার মাত্র প্রদক্ষিণ করিতেছে। তাহা হইলে আমাদের ২৫০ বৎসর ঐ গ্রহের এক বৎসরের তুল্য। ইহা সূর্য্য হইতে এতদূরে অবস্থিত যে, ঐ গ্রহে জল ও বায়ু থাকিলে জমিয়া কঠিন হইয়া গিয়া থাকিবে।

মাধ্যাকর্ষণের অনুশাসন যে কল্পনা নহে, অতি বাস্তব, তাহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল নেপচুন ও প্লুটোর ঐরূপ আবিষ্কারে। এই অনুশাসনের আর একটি প্রমাণ যে, ঐ বিধি অনুযায়ী কষা পথেই গ্রহ উপগ্রহগুলিকে ছুটিতে দেখা যায়। এই কারণেই বহু পূর্ব্ব হইতেই গ্রহ উপগ্রহাদির ভবিষ্যৎ গতিপথের বিষয় সঠিক বলা চলে।

১৯

জ্যোতিষীর মাপকাঠি

যেমন দৈর্ঘ্য মাপিবার প্রয়োজন হয়, মানুষ তাহার উপযুক্ত মাপকাঠি স্থির করে। দৈর্ঘ্য বা দূরত্ব অল্প হইলে সাধারণতঃ আমরা আঙ্গুলের প্রস্থ দিয়া মাপি, বলি চার আঙ্গুল, পাঁচ আঙ্গুল ইত্যাদি। উহাপেক্ষা ব্যবধান অধিক হইলে বিঘৎ বা হাত দিয়া মাপি। তাহাপেক্ষাও বড় হইলে ক্রোশ, যোজনাদি দিয়া দৈর্ঘ্য

নিরূপণ করি। ইংরাজি হিসাবে ব্যবধান অনুযায়ী ইঞ্চি, ফুট, গজ বা মাইল ধরিয়া দূরত্ব মাপা হয়।

কিন্তু মহাকাশের গ্রহ নক্ষত্রাদির ব্যবধান মাপিতে হইলে ঐরূপ ক্ষুদ্র মাপ কাঠিতে কুলায় না। মাইল-মানদণ্ডে মাপিয়া পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব দাঁড়ায় প্রায় ৯৩,০০০,০০০ মাইল। এক নক্ষত্র হইতে আর এক নক্ষত্রের ব্যবধান ঐ মানদণ্ডে মাপা অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। এই কারণে মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রাদির ব্যবধান মাপিতে হইলে নূতন মানদণ্ডের প্রয়োজন।

জ্যোতিষীর 'এক'

আমরা ধরাপৃষ্ঠে চাপিয়া সূর্য্যকে বৎসরে প্রায় চক্রাকার পথে একবার প্রদক্ষিণ করি। এই পথে ছয় মাসে আকাশের একস্থান হইতে ১৮৬,০০০,০০০ মাইল দূরে আমরা নিয়মিতভাবে নীত হই। ইহাই হইল পৃথিবীর উপবৃত্তীয় কক্ষপথের তুইটী বিন্দুর দূরতম ব্যবধান। পৃথিবী-কক্ষের পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত এই ব্যবধানের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই। জ্যোতিষীগণ এই নির্দ্দিষ্ট ব্যবধানকে (১৮৬,০০০,০০০ মাইল) মাপকাঠি ধরিয়া সৌরমণ্ডলের গ্রহ উপগ্রহাদির দূরত্ব নির্ণয় করেন। এই ১৮৬,০০০,০০০ মাইল দীর্ঘ মাপকাঠিকে তাঁহারা astronomical unit বা জ্যোতিষীর "এক" ধরেন।

ক্রমশঃ জ্যোতিষবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে, এক নক্ষত্র হইতে অন্য কোন নক্ষত্রের ব্যবধান মাপিবার সময় এই মানদণ্ডও অতি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয়। তখন নূতন মাপকাঠির খোঁজ পড়িল। দূরত্বের বিশালতা অনুযায়ী বিশাল মাপকাঠির প্রয়োজন হয়।

আলোক-বৎসর (Light-years)

আলোক এক সেকেণ্ডে প্রায় ১৮৬,০০০ মাইল ছুটে। তাহা হইলে এক বৎসরে আলোক ১৮৬,০০০ × ৩৬৫ × ২৪ × ৬০ × ৬০ মাইল ছুটিবে। এই কল্পনাতীত দূরত্বকে এক মাপকাঠি ধরিয়া ব্রহ্মাণ্ডের দূরত্ব নিরূপণ করা হয়। এই

দূরত্বকে আলোক-বৎসর (Light-year) বলে। এই মাপকাঠি অনুযায়ী ভ্যান্ ম্যানেন্ (Van Mannen) নামক নক্ষত্রের পৃথিবী হইতে দূরত্ব মাত্র আট আলোক-বৎসর। তবে মহাকাশে এমন নক্ষত্রও দুর্লভ নহে, যে-স্থান হইতে আলোক আসিতে ৫০,০০০ বৎসর লাগে। এরূপ ক্ষেত্রে ঐরূপ কল্পনাতীত দীর্ঘ মাপকাঠির প্রয়োজন।

২০

নক্ষত্র

(ক) গড়ে ভার

সহস্র সহস্র কোটি নক্ষত্রের মধ্যে আমরা এতক্ষণ মাত্র সূর্য্যের বিষয়ই কতকাংশ বলিলাম। মহাকাশের বিরাট গর্ভে, আমাদের দূরতম গ্রহ প্লুটো হইতে কল্পনাতীত দূরে—সৌরমণ্ডলের গণ্ডি হইতে বহুদূরে, সূর্য্যেরই মত জ্বলন্ত অসংখ্য ছোট বড় পিণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা এত দূরে আছে যে উহাদিগের গ্রহ উপগ্রহাদি আছে কিনা বুঝিবার উপায় নাই।

কিন্তু লক্ষ্য করিলে একটা বিষয় ধরা পড়ে। মহাকাশের কোন কোন স্থানে একাধিক নক্ষত্র এক অপরের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া পলায় না, সর্ব্বদাই একটি দলে থাকিতে দেখা যায়। সৌর-পরিবারভুক্ত গ্রহ উপগ্রহাদির মত মাধ্যাকর্ষণ বশে এক অপরের সঙ্গ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারে না, এইরূপ সিদ্ধান্ত অমূলক হইবে না।

এরূপ নক্ষত্রগুলিকে মনে হয় যেন উহারা মহাকাশের অনন্ত দেশের একাংশে গিয়া একটি উপনিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছে। এইরূপ একটি উপনিবেশ আমাদের সৌরমণ্ডলের অতি নিকটেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপনিবেশটি তিনটি তারকায় গঠিত—একটি অতি ম্লান ও দুইটি উজ্জ্বল।

মহাকাশের বহুস্থানে দুইটি নক্ষত্রকে এক সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ যুগ্ম নক্ষত্র এক অপরকে অবিরাম প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহাদিগের এক অপরের প্রতি আসক্তি দেখিয়া মনে হয়, মাধ্যাকর্ষণ বশেই কেহ কাহাকেও ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেছে না। জ্যোতিষী এইরূপ কয়েকটি ক্ষেত্রে একটি নক্ষত্রের অপরটির চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে হইলে কতখানি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রয়োজন, তাহা কষিয়া নক্ষত্র দুইটির ভার বাহির করিয়াছেন।

গণনার ফলাফল বড় মজার। আমাদের সূর্য্যের আকারের অনুপাতে উহা-দিগের ভার গড়ে সাধারণ বলিয়াই বোধ হয়। একটি দলে চারিটি নক্ষত্র (27 Canis Majoris) দেখিতে পাওয়া যায়; এই নক্ষত্র-চতুষ্টয়ের মিলিত ওজন সূর্য্যের সহস্রগুণ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এইরূপ বিপুলভার নক্ষত্রের সংখ্যা খুবই অল্প। সূর্য্যের দশগুণ ভারি নক্ষত্রও অতি দুর্লভ, এবং সূর্য্যের এক দশমাংশ ভারি নক্ষত্রও খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। মোটামুটি মনে হয়, নক্ষত্রগুলি গড়ে প্রায় আমাদের সূর্য্যেরই মত ভারি।

(খ) প্রভা

নক্ষত্রগুলির ভারে বিশেষ প্রভেদ ধরা পড়ে না, কিন্তু উহাদিগের প্রভায় অসম্ভব তারতম্য দেখা যায়। লুব্ধক আকাশের সর্ব্বাপেক্ষা দীপ্তিময় নক্ষত্র। ইহারই সহচররূপে যে নিষ্প্রভ তারকাটি দেখিতে পাওয়া যায়, উহা সিরিয়সের তুলনায় মাত্র এক-অযুতাংশ প্রভাময়। ফলে সিরিয়সের ঔজ্জ্বল্যের মধ্যে এই ম্লান নক্ষত্রটি সর্ব্বদা এমন ভাবে মিলাইয়া আছে যে ১৮৬২ খৃঃ পর্য্যন্ত ইহা কাহারও চক্ষেই পড়ে নাই। ইহা সিরিয়সের মাধ্যাকর্ষণ বশে উহাকে ক্রমাগত প্রদক্ষিণ করিতেছে, সেই জন্য উহা লুব্ধকের নিকটেই আছে বলিতে হইবে। অতএব লুব্ধকের (Sirius) সহচরটি উহা অপেক্ষা দূরে আছে বলিয়া এত নিষ্প্রভ দেখায় না; উহা নিজেই নিষ্প্রভ বলিয়া নিষ্প্রভ দেখায়।

উজ্জ্বল সরমা বা প্রোসিয়ম (Procyom) নামক তারকাটির সহচরটি মাত্র

উহার একলক্ষাংশ দীপ্তি দেয়। এইরূপ প্রধান তারকার সহিত উহার সহচরের আলোর বিষম প্রভেদ প্রায়ই ধরা পড়ে।

সাধারণতঃ দুইটি নক্ষত্রের দূরত্ব জানা না থাকিলে উহাদিগের দীপ্তি আমরা তুলনা করিতে পারি না। কোন তারকা দূরত্বের জন্য কতখানি ম্লান দেখাইতেছে জানা না থাকিলে উহার প্রভার ঠিক তীব্রতা ধরা পড়ে না।
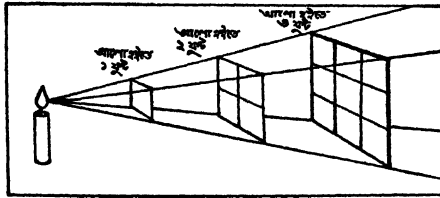
এক ফুট দূরে আলোর উৎস থাকিলে প্রতি বর্গ ইঞ্চি যতটুকু আলো পাওয়া যাইবে, দুই ফুট দূরে মাত্র উহার এক চতুর্থাংশ আলো প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে পৌছিবে; তিন ফুট দূরে থাকিলে প্রতি বর্গ ইঞ্চি উহার এক নবমাংশ আলো পাইবে। এইরূপে আলো বা বিকীর্ণ তেজের তীব্রতা দূরত্বে হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত বাড়ে বা কমে।

একটি মোমবাতির (Candle power) আলোর তুলনায় ধরাপৃষ্ঠের সৌরালোকের তীব্রতা মাপিয়া সূর্য্যের দূরত্বের (৯২,৯০০,০০০ মাইল) সহিত হিসাব করিলে দেখা যায় সূর্য্য ৩,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ মোমবাতির মত আলো দেয়।

লুব্ধক (Sirius) সূর্য্যের পাঁচলক্ষ গুণ দূরে আছে। সূর্য্য হইতে আলোক পৃথিবীতে আসিতে প্রায় আট মিনিট লাগে, লুব্ধক হইতে আলো আসিতে আট বৎসরেরও অধিক সময় লাগে।

লুব্ধকের দীপ্তি সূর্য্যের ছাব্বিশ গুণ। ইহার বিকীর্ণ তাপও তদ্রূপ। আজ যদি হঠাৎ সূর্য্যের স্থান লুব্ধক গ্রহণ করে, তাহা হইলে আমাদের পার্থিব হিম-মণ্ডলের শেষ বরফটুকুও দেখিতে দেখিতে গলিয়া, ফুটিয়া বাষ্পে পরিণত হইয়া

আকাশে মিলাইয়া যাইবে এবং ধরাপৃষ্ঠের প্রাণের স্রোত এক নিমেষে শুকাইয়া যাইবে। উহার নিষ্প্রভ সহচরটির আলো সূর্য্যের এক বিংশাংশের তুল্য। এইটী যদি সূর্য্যের স্থান গ্রহণ করে, তাহা হইলে ধরাপৃষ্ঠের নদ, নদী, হ্রদ, সমুদ্রগুলি, এমন কি উগ্রতপ্ত সাহারার বক্ষ দেখিতে দেখিতে জমিয়া শুষ্ক কঠিন বরফে পরিণত হইবে এবং আমাদের বায়ুমণ্ডল জমিয়া তরল আকার ধারণ করিবে।

আমাদের জানা নক্ষত্রগুলির মধ্যে উলফ্ ৩৫৯ (Wolf 359) নামক নক্ষত্রটি ম্লানতম। উহা লুব্ধকের ম্লান সহচরটির আলোর একশতাংশ মাত্র আলো দেয়। অন্যদিকে এস. ডোরাডাস্ (S. Doradus) নক্ষত্রটি উজ্জ্বলতম। এই জাতীয় নক্ষত্রগুলির আলোর তীব্রতা তরঙ্গাকারে বাড়ে ও কমে। ইহা উজ্জ্বলতম অবস্থায় আমাদের সূর্য্যের পাঁচলক্ষগুণ আলো দেয়। ইহা হইতে এক মিনিটে যতখানি আলো বিশ্বে ছড়ায়, আমাদের সূর্য্যে এক বৎসরে তত পরিমাণ আলো দেয়। হঠাৎ যদি আমাদের সূর্য্য এইরূপ উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করে, তাহা হইলে এক নিমেষে আমাদের পৃথিবী তাহার আশ্রিত সারা জীবকুল লইয়া বাষ্পে পরিণত হইবে। আমাদের সূর্য্যকে একটি মোমবাতি ধরিলে, এস. ডোরাডাসের সহিত এক শক্তিশালী সন্ধানী আলোর (searchlight) এবং উলফ্ ৩৫৯-এর সহিত একটি জোনাকী পোকার তুলনা করা চলে।

(গ) বর্ণ

যাঁহারা ফটোগ্রাফ্ তোলেন তাঁহারা ভাল করিয়াই জানেন যে ছবিতে লাল রং কাল হইয়াই দেখা দেয় এবং নীল রং সাদা হইয়া ফুটিয়া উঠে। এই অদ্ভুত বর্ণ-বিভ্রাট বিচার করিতে গিয়া দেখা গেল যে ক্যামেরা আমাদের চক্ষুর তুলনায় যেমন নীল রং সম্পর্কে পক্ষপাতী, ঠিক তেমনি লাল রং সম্পর্কে উদাসীন। ক্যামেরা দিয়া মহাকাশের ছবি তুলিলে এইরূপ বর্ণ-বিভ্রাট ঘটে।

মহাকাশের যে কোন অংশের ফটোগ্রাফ লইলে ছবিতে কতকগুলি নক্ষত্র অসাধারণ দীপ্তিময় ও কতকগুলি অতিশয় ম্লান হইয়া ফুটিয়া উঠে। নক্ষত্রগুলি নানা বর্ণের বলিয়া এইরূপ ঘটে। কতকগুলি নক্ষত্র উজ্জ্বল নীল, কতকগুলি বা

সাধারণ অপেক্ষা রক্তবর্ণ। ক্যামেরা রক্তবর্ণের প্রতি অত্যন্ত উদাসীন হওয়ায় ঐগুলি অতি ম্লানরূপে ফুটিয়া উঠে, কিন্তু নীল নক্ষত্রগুলির প্রতি অত্যন্ত পক্ষপাতী হওয়ায় ঐগুলি উজ্জ্বলরূপে দেখা দেয়। মানুষ যে পক্ষপাতিত্ব দোষের জন্য অনেক ভুল করে ও ভুল বোঝায়, ঠিক্ সেইরূপ ক্যামেরাও পক্ষপাতিত্ব দোষের জন্য ভুল করে এবং আমাদিগকে ভুল বোঝায়। কালপুরুষ (Orion) নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে আল্‌ফা (Alpha) নামক নক্ষত্রটি নগ্নচক্ষে বেশ উজ্জ্বল দেখায়। এইটি মহাকাশের দ্বাদশটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের মধ্যে অন্যতম। ইহার রং গাঢ় রক্তবর্ণ, সেই জন্য ফটোগ্রাফে দেখায় অতি নিষ্প্রভ। ঐ নক্ষত্রপুঞ্জের আরও তিনটি নক্ষত্র নগ্নচক্ষে অতি নিষ্প্রভ দেখায়, কিন্তু ইহাদের বর্ণ নীল বলিয়া ছবিতে উজ্জ্বল তারকারূপে ইহারা ফুটিয়া উঠে।

ক্যামেরার পক্ষপাতিত্ব দোষ কিন্তু শাপে বর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নগ্নচক্ষে দেখা রূপের সহিত ফটোগ্রাফের ছবির তুলনা করিয়া আমরা নক্ষত্রের আসল রং বলিয়া দিতে পারি। অন্যান্য উপায়েও নক্ষত্রের রং জানিতে পারা যায়। অন্যান্য উপায়ে জানা নক্ষত্রের রংএর সহিত উল্লিখিত উপায়ে জানা রংএর অদ্ভুত মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

(ঘ) তাপমাত্রা

নক্ষত্রগুলি এইরূপ বিভিন্ন বর্ণের হইবার কারণ কি? কর্ম্মকার লৌহখণ্ড তাতাইবার সময় লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে লৌহখণ্ডের তাপমাত্রা বৃদ্ধির সহিত উহাতে ক্রমশঃ নানা বর্ণ দেখা দিতেছে। প্রথমে ফিকে লাল, তাহার পর গাঢ় লাল, তাহার পর হরিদ্রা, তাহার পর উহা প্রায় শ্বেত বর্ণ ধারণ করে। তাপের মাত্রাবৃদ্ধির সহিত উহার বর্ণেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে।

কারখানার চুল্লীর তাপমাত্রা নিরূপণ করিতে হইলে উহা রং দেখিয়া প্রথমতঃ ঠিক করিতে হয়। সামান্য লাল আভায় এক তাপমাত্রা, ফিকে লালে আর এক, গাঢ় লালে তদপেক্ষা তীব্র তাপমাত্রা নির্দ্দেশ করে। তাপমাত্রার ধাপে ধাপে বর্ণেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে বলিয়া বর্ণ দেখিয়া তাপমাত্রা নিরূপণ করা সহজ। চুল্লীর

অগ্নিশিখা রংএর বিচার করিয়া চুল্লীগর্ভের তাপমাত্রা জানিবার যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে।

ঠিক এইরূপ উপায়েই জ্যোতিষীগণ নক্ষত্রের তাপমাত্রা জানিতে পারেন। নক্ষত্রগুলির মধ্যে তাপমাত্রানুযায়ী কোনটি অনুজ্জ্বল লাল, কোনটি হরিদ্রা বর্ণ, কোনটি শুভ্র, কোনটি উজ্জ্বল নীল, আবার কোনটি বা বেগুনী দেখায়। লাল নক্ষত্রগুলি সর্ব্বাপেক্ষা শীতল, মাত্র ১৪০০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (এই মানদণ্ডে ১০০ ডিগ্রি তাপে জল ফোটে); তাহার পর হরিদ্রা বর্ণের নক্ষত্রগুলির তাপ-মাত্রা প্রায় ২৮০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আমাদের সূর্য্যের মত বর্ণের নক্ষত্রগুলির তাপমাত্রা ৫৫০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সর্ব্বাপেক্ষা তপ্ত নক্ষত্রগুলির তাপমাত্রা প্রায় ৭০,০০০ ডিগ্রি ফারেণহাইট (এই মানদণ্ডে জল জমিয়া বরফ হয় ৩২ ডিগ্রিতে এবং জল ফুটে ২১২ ডিগ্রিতে)।

(৬) আকার

২৫৫০ ডিগ্রি হইতে ৭০,০০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্য্যন্ত যে তাপমাত্রা, উহার অধিকাংশ আমাদের ধারণাতীত। দুই একটা উদাহরণ হইতে ঐরূপ তীব্র তাপের কিঞ্চিৎ ধারণা হইতে পারে। ৭০,০০০ ডিগ্রি তপ্ত এক বর্গ ইঞ্চি স্থান হইতে যে পরিমাণে তাপ বিকীর্ণ হয়, উহা বাষ্পীয় শক্তিতে রূপান্তরিত করিলে উহার সাহায্যে ৬০,০০০ টনের একটি অতিকায় জাহাজ সমুদ্র পারাপার করিতে পারে। অন্য পক্ষে ২৫৫০ ডিগ্রি তপ্ত এক বর্গ ইঞ্চি হইতে যে পরিমাণে তাপ পাওয়া যায় উহার দ্বারা একটি জেলে ডিঙ্গিও নড়াইতে পারা যায় না। এইরূপ তপ্ত এক বর্গ ইঞ্চি ভূমি হইতে যে পরিমাণ তাপ বিকীর্ণ হয়, উহার তিন লক্ষ গুণ তাপ ৭০,০০০ ডিগ্রি তপ্ত এক বর্গ ইঞ্চি ভূমি হইতে পাওয়া যায়। অতএব যদি ঐরূপ অল্প তপ্ত নক্ষত্রকে উল্লিখিত অতি তপ্ত নক্ষত্রের সমান তাপ বিকীরণ করিতে হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্তের তাপ-বিকীরণ-ভূমি শেষোক্তের তিন লক্ষ গুণ হওয়া প্রয়োজন।

এই সিদ্ধান্ত হইতে মনে হয় নক্ষত্রগুলির আকার নানা প্রকারের। অল্প লাল কোন নক্ষত্রের যদি সাধারণ ঔজ্জ্বল্য দেখা যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে উহার আকার অতি বিশাল; কেননা অল্প লাল নক্ষত্রের পৃষ্ঠ হইতে উজ্জ্বল আলো পাইতে হইলে উহার তেজ-বিকীরণ-ভূমি অতি বিশাল হওয়া প্রয়োজন। পূর্ব্বোক্ত কালপুরুষ নক্ষত্রপুঞ্জের 'আল্‌ফা' নক্ষত্রটি দেখিতে রক্তাভ, কিন্তু উহা সূর্য্যের ছয় হাজার গুণ তেজ বিকীরণ করে। ইহা রক্তাভ, অথচ সূর্য্য দেখিতে অত্যুজ্জ্বল। অতএব ইহাকে সূর্য্যের ছয় হাজার গুণ তেজ বিকীরণ করিতে হইলে, সৌরপৃষ্ঠের ছয় হাজার গুণের বহুগুণ বিকীরণ-ভূমি ইহার থাকা উচিত।

কাল-পুরুষ নক্ষত্রপুঞ্জের আল্‌ফা নক্ষত্রের রং দেখিয়া আমরা উহার তাপমাত্রা নির্দ্ধারণ করিতে পারি। দূরবীক্ষণে ধরা আলোর বিচারে উহার পৃষ্ঠের প্রতি বর্গ ইঞ্চি হইতে বিকীর্ণ তাপের পরিমাণ জানিতে পারা যায়। প্রথমটি হইতে নক্ষত্রের সমষ্টি তাপ এবং দ্বিতীয়টি হইতে উহার প্রতি বর্গ ইঞ্চির তাপ পরিমাণ জানিতে পারায় উহার সারা পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল—একেকে অপর দিয়া ভাগ দিয়া—জানা খুবই সহজ। পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল জানা থাকিলে উহার আকার নিরূপণ করা অতি সহজ। অন্য আরও দুই একটি উপায়ে আকার নিরূপণ করিয়া একই ফল পাওয়ায় বর্ণ সাহায্যে আকার নিরূপণের নির্ভুলতা প্রমাণিত হয়।

এইরূপে নক্ষত্রগুলির আকার নিরূপণ করিয়া উহাদিগের বৈচিত্র্যে স্তম্ভিত হইতে হয়। ভ্যান্ ম্যানেন নক্ষত্রটির আকার আমাদের পৃথিবীর মত। এইটি বোধ হয় জানা নক্ষত্রগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতম। অন্যপক্ষে কালপুরুষ-আলফার ভিতরে আমাদের সূর্য্যের মত কোটি কোটি পিণ্ড ধরিতে পারে।

২১

নক্ষত্রের শ্রেণীবিভাগ

সাধারণের দৃষ্টিতে মনে হয় মহাকাশের ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য নক্ষত্রগুলিকে বহু শ্রেণীতেই ভাগ করা চলে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। জ্যোতিষীগণ এই অসংখ্য নক্ষত্রগুলিকে তিন শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন : (১) শ্বেতবর্ণ বামন (White Dwarfs), (২) ক্রমবদ্ধ সাধারণ (Main sequence stars), (৩) রক্তবর্ণ অতিকায় (Red Giants)।

পূর্ব্বেই তোমরা পরমাণুর গঠন* সম্পর্কে কিছু পড়িয়াছ। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে গুরু অংশ এবং উহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া অবিরাম ছুটিতে থাকে কতকগুলি লঘু বীজ। এই লঘু বীজগুলি কেন্দ্রের গুরু অংশের তুলনায় প্রায় ভারহীন বলিলেই চলে। এক একটি পরমাণু অনেকাংশে আমাদের সৌরমণ্ডলের মত। সূর্য্য থাকে কেন্দ্রে এবং উহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া উহার তুলনায় অতি লঘু গ্রহগুলি অবিরাম ছুটিতেছে।

আমাদের পৃথিবীর মত উত্তপ্ত স্থানে পরমাণুর গুরু কেন্দ্রের আকর্ষণ কাটাইয়া লঘু বীজগুলি ছুটিয়া পলাইতে পারে না ; ফলে পরমাণুগুলির গঠনে কোনই পরিবর্ত্তন ঘটে না। কিন্তু সূর্য্যের পৃষ্ঠদেশের প্রচণ্ড উত্তাপের ফলে পরমাণুমণ্ডলের দূরতম লঘু বীজগুলি কেন্দ্রের বাঁধন কাটাইয়া ছুটিয়া পলায়। সৌর কেন্দ্রের অধিকাংশ লঘু বীজগুলিই ঐরূপ ভাবে উহাদিগের কেন্দ্রের বাঁধন হইতে মুক্তি পায় ; থাকে মাত্র পরমাণুর কেন্দ্রে দুইটি লঘু বীজ। এই দুইটির উপর পরমাণুমণ্ডলের গুরুবীজপুঞ্জের আকর্ষণ এমনই দৃঢ় যে, সৌরকেন্দ্রের চারি কোটি ডিগ্রি উত্তাপেও উহা শিথিল হয় না।

* "অদ্ভুত কথা" দেখ।

শ্বেতবর্ণ বামন শ্রেণী (White Dawarfs)

নক্ষত্রগুলির মধ্যে এমন বহু নক্ষত্র আছে যেগুলির কেন্দ্রদেশের উত্তাপ সৌর-কেন্দ্রের উত্তাপের দশ গুণ, বিশ গুণ এমন কি পঞ্চাশ গুণ। এই প্রচণ্ড উত্তাপে কোন পরমাণুমণ্ডলের কেন্দ্রীয় গুরুবীজপুঞ্জই উহার চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমান লঘু বীজগুলিকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় কেন্দ্রীয় গুরুবীজের আসক্তি শিথিল হইয়া পড়ায় চতুর্দ্দিকে নিয়মিত ভ্রাম্যমান লঘু বীজগুলি ছুটিয়া যে যে-দিকে পারে বাহির হইয়া পড়ে। এইরূপ প্রচণ্ড উত্তপ্ত নক্ষত্রের কেন্দ্রদেশে প্রতি পরমাণুটি সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া পড়ে বলিয়া ঐ স্থানে পরমাণু কণা বিনা আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কেন্দ্রীয় গুরুবীজপুঞ্জের বন্ধন শিথিল হওয়ায় এই পরমাণুকণাগুলি কোন শৃঙ্খলা বা অনুশাসনের বাধ্য নহে। পরমাণু সমাজে একটা বিরাট বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং গুরু ও লঘু বীজগুলির খেয়াল মত ছুটোছুটির ফলে একটা একাকার মেলাভাবের সৃষ্টি হয়। একের মেলাতেই জড়ের আদিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের পৃথিবীতে কিন্তু জড়ের এই আদিরূপ দেখিতে পাওয়া সম্ভব নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পরমাণুমণ্ডল ও সৌরমণ্ডলের অনুশাসন প্রায় এক। সৌর মণ্ডলের কেন্দ্রীয় সূর্য্য হইতে দূরে দূরে থাকিয়া যেমন ভ্রাম্যমান গ্রহগুলি সূর্য্যকে অবিরাম প্রদক্ষিণ করে, ঠিক সেইরূপ পরমাণুমণ্ডলের কেন্দ্রীয় গুরু পুরুষবীজকে আকারের অনুপাতে বহু দূরে দূরে থাকিয়া, লঘু স্ত্রীবীজগুলি অবিরাম প্রদক্ষিণ করে। পুরুষ ও স্ত্রী বীজগুলির আকারের অনুপাতে উহাদিগের পারস্পরিক ব্যবধান বহুগুণ অধিক।

এই ব্যবধান মহাশূন্য আকাশে জুড়িয়া আছে। এই অতি সূক্ষ্ম পরমাণু-মণ্ডলের তুলনায় আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি এত স্থূল যে পরমাণুমণ্ডলের গুরু ও লঘু বীজগুলির মধ্যে ব্যবধানের ফাঁক কিছুতেই ধরা পড়ে না।

প্রচণ্ড তপ্ত নক্ষত্রকেন্দ্রে পরমাণুগুলি আসক্তির অভাবে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পড়ায় উল্লিখিত পরমাণুমণ্ডলের গুরু ও লঘু বীজগুলির মাঝের ফাঁক আর থাকিতে পায়

না। নক্ষত্রের পদার্থ সমষ্টির বিরাট চাপে চূর্ণীকৃত পরমাণুকণাগুলি কেন্দ্রে গিয়া ঠাসাঠাসিভাবে জমা হয়। ফলে অতিকায় নক্ষত্র ক্ষুদ্রকায় বামনে পরিণত হয়।

প্রথমতঃ, কেন্দ্রের প্রচণ্ড উত্তাপে পরমাণুমণ্ডল ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাহার পর অনুশাসনের অভাবে গুরু পুরুষ ও লঘু স্ত্রীবীজগুলির মধ্যে শৃঙ্খলিত বিশাল ব্যবধান আর থাকে না। ইহার পর অতিকায় নক্ষত্রগুলির বিরাট ভারে পরমাণু কণাগুলি কেন্দ্রে অতিশয় ঘনভাবে জমা হয়। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে অতিকায় নক্ষত্র ক্ষুদ্রকায় বামনে পরিণত হয়। আকারে আমাদের পৃথিবীর মত ভ্যান্ ম্যানেনের নক্ষত্রটি এইরূপ শ্রেণীর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ

লুব্ধকের সহচরটি এইরূপ একটি বামন নক্ষত্র। আকারে ইহা পৃথিবীর ত্রিশগুণ, কিন্তু ইহার উপাদান সমষ্টি পৃথিবীর তিন লক্ষগুণ ; অতএব ইহা পৃথিবীর তুলনায় দশহাজার গুণ ঘন। আমরা পৃথিবীতে যদি এইরূপ ঘনভাবে আমাদের জিনিষ রাখিতে পারিতাম তাহা হইলে মনিব্যাগের মধ্যেই বিশহাজার মণ চাউল রাখা সম্ভব হইত।

এই জাতীয় নক্ষত্রগুলির পদার্থ সমষ্টি অতি ঘন হওয়ায় ক্ষুদ্রকায় বামন নক্ষত্রের প্রতি-সূচ্যগ্রভূমি হইতে অতি তীব্র তেজ বিচ্ছুরিত হয়। অতিকায় নক্ষত্রের বিশাল পৃষ্ঠদেশ হইতে যে অপরিমেয় তেজপুঞ্জ বিকীর্ণ হইত, উহাই বামন নক্ষত্রের অল্প পরিসর পৃষ্ঠ হইতে বিকীর্ণ হওয়ায় উহার প্রতি-সূচ্যগ্র ভূমি হইতে অতি তীব্র তেজ বিচ্ছুরিত হয়। ফলে বামন নক্ষত্রগুলি তীব্র জ্যোতিষ্মান দেখায়। আকারে ক্ষুদ্র বলিয়া বামন এবং প্রচণ্ড তপ্ত বলিয়া শ্বেতবর্ণ ; উভয় কারণের জন্য এই জাতীয় নক্ষত্রের নাম রাখা হইয়াছে শ্বেতবর্ণ বামন।

ক্রমবদ্ধ শ্রেণী (Main sequence stars)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সৌরকেন্দ্রের পরমাণুমণ্ডলের কেন্দ্রীয় বীজের অনুশাসন শিথিল হওয়ায় অধিকাংশ লঘুবীজগুলি মুক্তি পাইয়া নিজের খেয়াল মত ছুটাছুটি

করে। দুইটি মাত্র লঘুবীজ তখনও গুরুবীজকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। এইরূপে পরমাণুমণ্ডল আংশিক ভাবে ভাঙ্গিয়া পড়ায় পদার্থ সমষ্টি ঘনতর আকার গ্রহণ করিলেও শ্বেতবর্ণ বামনের মত ঘনতম হইতে পায় না। আমাদের সূর্য্য এই জাতীয় নক্ষত্রের সুন্দর উদাহরণ।

মহাকাশের সংখ্যাতীত নক্ষত্রগুলির শতকরা আশীটি এই শ্রেণীভুক্ত বলিয়া বোধ হয়। এই শ্রেণীর নক্ষত্রগুলির কেন্দ্রের উত্তাপ সৌরকেন্দ্রের উত্তাপের মত; ফলে ঐস্থানে পরমাণু মণ্ডলের কেন্দ্রীয় গুরুবীজের চতুর্দ্দিকে দুইটি মাত্র লঘুবীজ প্রদক্ষিণ করিতেছে। ঐ স্থানের নক্ষত্রের পদার্থ সমষ্টি বেশ ঘনভাবে সজ্জিত। আমাদের সৌরমণ্ডলের বুধ ও শুক্র ব্যতীত অবশিষ্ট গ্রহগুলি, হঠাৎ যদি সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ শিথিল হওয়ায় মুক্তি পায়, তাহা হইলে বিস্তৃত সৌরমণ্ডল যেরূপ সঙ্কুচিত ও ঘন আকার ধারণ করিবে, ঐ সকল নক্ষত্রে পরমাণুমণ্ডল ভাঙ্গিয়া পড়ায় প্রায় ঐরূপ অবস্থা ঘটে। এই শ্রেণীর নক্ষত্রগুলি প্রায় আকারে এক; শ্বেতবর্ণ বামন নক্ষত্র অপেক্ষা বড় বটে, তবে অতিকায় নহে।

এই শ্রেণীভুক্ত নক্ষত্রগুলি আকারে প্রায় এক হইলেও উহাদিগের বর্ণ ও ভারের বৈচিত্র্যের সংখ্যা হয় না। সৌরলোকের বর্ণছত্রে (spectrum) যে অসংখ্য রংএর মেলা চোখে পড়ে, এই শ্রেণীভুক্ত নক্ষত্রগুলির বর্ণে তাহার কোনটিরই অভাব হয় না। মরা লাল হইতে আরম্ভ করিয়া উজ্জ্বল ভায়লেট পর্য্যন্ত সকল রংই দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের ওজনগুলিও ক্রমবর্দ্ধমান সারিতে সাজান চলে।

ইহাদিগকে ক্রমবর্দ্ধমান ভার অনুযায়ী সাজাইলে একটি অতি অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ে। ক্রমবর্দ্ধমান ভার অনুযায়ী সাজাইলে দেখা যায় যে নক্ষত্রগুলি বর্ণছত্রের বর্ণানুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা গুরু নক্ষত্রগুলির রং নীল, তাহার পর শ্রেণীবদ্ধ নক্ষত্রগুলির যেমন-যেমন ওজন কমিতে দেখা যায় ঠিক সেই ক্রমানুসারে বর্ণছত্রের নীল হইতে লালের দিকে রং উহারা গ্রহণ করিতে

থাকে। এই জাতীয় নক্ষত্রগুলিকে এইরূপ ক্রমানুসারে সাজাইতে পারা যায় বলিয়া জ্যোতিষীগণ ইহাদিগকে ক্রমবদ্ধ শ্রেণী বলেন।

পীত বা রক্তবর্ণ অতিকায় শ্রেণী (Red Giants)

এই শ্রেণীর নক্ষত্রগুলির কেন্দ্র প্রথম দুই শ্রেণীর অপেক্ষা শীতল। ইহাদিগের গর্ভদেশের তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত শীতল হইলেও দশ লক্ষ ডিগ্রির কম নহে। এইরূপ অপেক্ষাকৃত অল্প তাপে পরমাণুমণ্ডলের লঘু বীজগুলির উপর গুরু বীজ-পুঞ্জের অনুশাসন খুব বেশী শিথিল হয় না। সেইজন্য পরমাণুমণ্ডলের দূরতম দুই একটি লঘুবীজ মাত্র অনুশাসন ভাঙ্গিয়া ছুটিয়া পলাইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় পরমাণুমণ্ডলে বেশ ফাঁক থাকিয়াই যায়, উহার ফলে ঐ নক্ষত্রগুলি বেশী ঘন ও গুরু হইতে পায় না।

এই জাতীয় নক্ষত্রের মধ্যে কালপুরুষ-আল্‌ফার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহা আকারে আমাদের সূর্য্যের প্রায় আড়াই কোটি গুণ, কিন্তু ওজনে মাত্র চল্লিশ গুণ। ইহা অপেক্ষাও আর একটি বৃহৎ নক্ষত্রের নাম অওমাইক্রন্ সেণ্টি (Omicron Centi) ; ইহার গর্ভে তিনকোটি সূর্য্য নাকি অনায়াসে ধরিতে পারে। এই নক্ষত্র জগতের দৈত্যের একটি সহচরীর অস্তিত্ব সম্প্রতি দূরবীক্ষণে ধরা পড়িয়াছে। এই সহচরীটি আকারে বামন ও প্রভায় অত্যুজ্জ্বল। এই অতিকায় অথচ অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ দৈত্যের সহচরীরূপে তীব্র প্রভাময়ী বামনকে দেখিয়া আরব্য উপন্যাসের কৃষ্ণকায় দৈত্যের পাশে তাহার লুণ্ঠিতা সুন্দরী মানবীর কথা মনে পড়ে। এই জাতীয় নক্ষত্রগুলির অধিকাংশের গর্ভে লক্ষ লক্ষ সূর্য্যের স্থান হইতে পারে। ইহাদিগের সমষ্টিতেজ বিকীরণ করিবার ক্ষমতা অত্যধিক হইলেও অতিকায়ের পৃষ্ঠদেশ এমনই বিশাল যে উহার বর্গ ইঞ্চি ভূমি হইতে যেটুকু তেজ বিকীর্ণ হয়, উহা সূর্য্যের বিকীর্ণ তেজের তুলনায় অতিশয় অল্প। বামন নক্ষত্রের এক বর্গ ইঞ্চি স্থান হইতে যদি পঞ্চাশ সহস্র অশ্বশক্তির তেজ বিকীর্ণ হয়, তাহা হইলে সূর্য্যের মত ক্রমবদ্ধশ্রেণীর নক্ষত্র হইতে পঞ্চাশ অশ্বশক্তি এবং অতিকায় নক্ষত্র হইতে অর্দ্ধ অশ্বশক্তিমাত্র তেজ বিকীর্ণ হয়।

এই তুলনা আনুপাতিক মাত্র। এই জাতীয় নক্ষত্রের প্রতি বর্গ ইঞ্চি পৃষ্ঠদেশ হইতে অতি অল্প পরিমাণ তেজ বিকীর্ণ হয় বলিয়া ইহাকে পীত বা রক্তবর্ণ দেখায়।

নাক্ষত্র তেজ (Stellar energy)

প্রতি নক্ষত্র অবিরাম যে তেজরাশি বিকীরণ করে, উহা আসেই বা কোথা হইতে এবং উহার শেষ পরিণতিই বা কি হইবে? **অদ্ভুত কথায়** তেজের (আলোর) ভারের কথা লিখিয়াছি। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে আমাদের সূর্য্য প্রতি সেকেণ্ডে তেজ বিকীরণ করিতে গিয়া চারি লক্ষ টন পদার্থ নষ্ট করে। এই হিসাবে প্রতি দিন সূর্য্য ওজনে ৩৫০০০ কোটি টন কমিতেছে।

নাক্ষত্র শক্তির উৎস

সাধারণতঃ এক প্রকার শক্তিকে অন্য প্রকারে রূপান্তরিত করিয়া লইয়া আমরা কাজে লাগাই। কয়লায় সঞ্চিত সৌরশক্তি কয়লাকে জ্বালাইয়া বা উহার পরমাণুগুলিকে প্রকারান্তরে সাজাইয়া আমরা মুক্ত করি এবং উহাকে দিয়া জলকে বাষ্পে পরিণত করিয়া লইয়া মনোমত খাটাইয়া লই। কিন্তু নক্ষত্রগর্ভে যে উগ্র তাপের পরিচয় আমরা পাই, ঐরূপ অবস্থায় পরমাণুমণ্ডলী ভাঙ্গিয়া পড়ে, উহাদিগকে নূতন প্রকারে সাজান ত দূরের কথা।

বহু লক্ষণ হইতে মনে হয় নাক্ষত্র গর্ভের প্রচণ্ড তাপে পরমাণুমণ্ডল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াই ক্ষান্ত হয় না ; জড়ের ঐ মুক্ত বীজগুলি বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছুটাছুটি করিতে করিতে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং তেজে রূপান্তরিত হইয়া মহাকাশে ছুটিতে থাকে।

আপনাকে নাশ করিয়া নক্ষত্রের এইরূপ জ্যোতিবিকাশ মহাকাশে এক অদ্ভুত ব্যাপার। জড়ের নাশে তেজের জন্ম,—এই অত্যদ্ভুত আবিষ্কারে নাক্ষত্র জগতের বহু সমস্যারই সমাধান পাওয়া যায়।

নক্ষত্রের আয়ু

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাচীন নক্ষত্রগুলি অনন্ত কাল ধরিয়া তেজ বিকীরণের

ফলে অবিরাম ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে হইতে বর্ত্তমানে পূর্ব্বাপেক্ষা লঘু হইয়া থাকিবে। অতএব লঘু নক্ষত্রগুলিকে সাধারণতঃ বয়সে প্রাচীন বলিয়াই ধরিতে হইবে।

যে পরিমাণে আমাদের সূর্য্যের পরমাণুগুলি তেজে পরিণত হইতেছে, উহাতে মনে হয় সূর্য্যের সকল পরমাণুগুলি তেজে রূপান্তরিত হইতে আরও ১৫,০০০,০০০ ০০০,০০০ বৎসর লাগিবে। প্রতি নক্ষত্রেরই আয়ুর তুলনায় মানব জাতির আজন্ম ইতিহাস পলকমাত্র মনে হয়। আর আমাদের এই পৃথিবী নক্ষত্রগুলির তুলনায় ধূলিকণাও নহে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

২২

ছায়াপথ (Milky Way)

পরিবর্ত্তনশীল আলোকবিশিষ্ট নক্ষত্র (Cepheid Variables)

মহাকাশে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে একটা অদ্ভুত জিনিষ চোখে পড়ে। অধিকাংশ নক্ষত্রগুলির আলোর কোন হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে না; কিন্তু কয়েকটি এমন নক্ষত্র আছে যেগুলির আলো নিয়মিত কমে ও বাড়ে। বহু পূর্ব্বেই ডেল্টা সেফি (Delta Cephei) নামা একটি নক্ষত্রের আলো ধীরে ধীরে কমিতে ও বাড়িতে লক্ষ্য করা হয়। দেখিলে মনে হয় যেন কেহ গ্যাসের আলো ধীরে ধীরে কমাইতেছে ও বাড়াইতেছে। লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল এই নক্ষত্রের আলো নিয়মিত পাঁচ দিন আট ঘণ্টায় ধীরে ধীরে একবার কমিয়া আবার দ্রুত বাড়িয়া পূর্ব্ব ঔজ্জ্বল্য লাভ করে।

এই জাতীয় কয়েকটি নক্ষত্র সৌরমণ্ডলের অপেক্ষাকৃত নিকটে দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলির দূরত্ব আমরা সাধারণ ত্রিকোণমিতি সাহায্যে মাপিতে পারি।* এইরূপে দূরত্ব কষিয়া কোন নক্ষত্রের আলোক শক্তি (Candle power)

* পরিশিষ্ট দেখ।

বাহির করা সহজ। এইগুলির দূরত্ব হইতে আলোক শক্তি কষিয়া দেখা গেল যে, সকলগুলির আলোক শক্তি এক। এরূপ নানা গবেষণার পর জ্যোতির্বিদগণ স্থির করিয়াছেন যে মহাকাশের যে নক্ষত্রগুলির আলো ডেল্টা সেফির মত হ্রাসবৃদ্ধিশীল উহাদের সকলগুলিরই আলোক শক্তি সমান।

এইরূপ যে নক্ষত্রগুলির আলোক নিয়মিত ক্রমানুসারে কমে ও বাড়ে; উহাদের দূরত্ব বাহির করা সহজ। এইরূপ কোন নক্ষত্রের আলোর হ্রাসবৃদ্ধির সময় লক্ষ্য করিয়া পাওয়া গেল, ধর পাঁচ দিন। সৌরমণ্ডলের নিকটস্থ এইরূপ কোন পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্রের আলোর হ্রাসবৃদ্ধির কালেও পাওয়া গেল পাঁচ দিন। পূর্ব্ব সিদ্ধান্তানুযায়ী এই উভয় নক্ষত্রের আলোক শক্তি এক। শেষোক্ত নক্ষত্রের দূরত্ব সাধারণ উপায়ে বাহির করিয়া উহার আলোক শক্তি আমরা জানিতে পারি। দূর আকাশের পরিবর্ত্তনশীল আলোকবিশিষ্ট অন্য নক্ষত্রটিরও এইরূপে আলোকশক্তির পরিমাণ জানিতে পারা গেল, যেহেতু উভয়ের আলোক শক্তিই এক। কিন্তু চক্ষে উহার আলোক শক্তি অন্যরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কতদূর হইতে আলোক আসিলে প্রকৃত আলোক শক্তি ঐরূপ ক্ষীণ দেখা যাইতে পারে ইহা জানা খুবই সহজ।

এই উপায়ে মহাকাশের দূরতম প্রদেশেও কোন পরিবর্ত্তনশীল আলোক-বিশিষ্ট নক্ষত্র পাওয়া গেলে ঐ প্রদেশের দূরত্ব জানিতে পারা সহজ হয়।

গোলাকার নক্ষত্রপুঞ্জ (Globular Clusters)

এক ঝাঁক মৌমাছি শূন্য আকাশে কোথাও ঠাসাঠাসি ভাবে আশ্রয় লইয়া ঝুলিতে লাগিল। এই মৌমাছি-পিণ্ডের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য মৌমাছি উড়িতেছে কল্পনা করিলে যেরূপ ঐ মৌমাছি ঝাঁকের আকার দাঁড়ায়, এইরূপ আকারে নক্ষত্র-পুঞ্জ আকাশে দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্যাবধি প্রায় একশত এইরূপ নক্ষত্রপুঞ্জ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। নগ্নচক্ষে দেখিলে এইগুলিকে অতি ম্লান দেখায় এবং মনে হয় পাঁচটি কি ছয়টি মাত্র নক্ষত্র ঐরূপ এক এক দলে আছে।

সুখের বিষয় এইরূপ গোলাকার নক্ষত্রপুঞ্জে এমন বহু নক্ষত্র আছে যেগুলির আলো নিয়মিত ধীরে ধীরে কমিয়া আবার দ্রুত গতিতে পূর্ব্বের ঔজ্জ্বল্য লাভ করে। এইরূপ নক্ষত্র থাকায় উহাদিগের দূরত্ব বাহির করা সহজ হইয়াছে। ঐরূপ একটি নিকটতম নক্ষত্রপুঞ্জ হইতে আলোক আমাদের পৃথিবীতে আসিতে ১৮,৪০০ বৎসর লাগে। যে আলোক এখন আমাদের চোখে আসিয়া লাগিতেছে উহা ১৮,৪০০ বৎসর পূর্ব্বে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল। এই আলোক রশ্মি যাত্রারম্ভ হইতে যতকাল ধরিয়া আমাদের দিকে ছুটিতেছিল, ততকালে আমাদের উর্দ্ধতন ছয়শত পুরুষ জন্মিয়াছে, আজীবন ভোগ করিয়াছে ও মরিয়াছে; কত সাম্রাজ্য কালের কোলে ফুটিয়াছে, আপন ঐশ্বর্য্যে জগতকে স্তম্ভিত করিয়াছে, আবার কালের কোলে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে।

এই পুঞ্জে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র আছে, উহাদিগের মধ্যে এমন বহু নক্ষত্র আছে যাহাদিগের দীপ্তির তুলনায় আমাদের সূর্য্য জোনাকি পোকা মাত্র। কিন্তু তাহারা এত দূরে যে সাদা চোখে দেখিলে অত্যন্ত ম্লান দেখায়।

এরূপ এমন নক্ষত্রপুঞ্জও দূরবীক্ষণে ধরা পড়িয়াছে যেস্থান হইতে আলোক আসিতে ১৮৫,০০০ বৎসর লাগে! এইরূপ নক্ষত্রপুঞ্জের সকলগুলির দূরত্ব হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে ঐগুলি মহাকাশের গর্ভে একটা শৃঙ্খলা অনুযায়ী সাজান আছে।

ছায়াপথ

আকাশ দেখিতে দেখিতে মানুষের মনে প্রথমে নিশ্চয়ই উদয় হয় যে নক্ষত্র-গুলি আকাশের সকল স্থানেই ছড়ান আছে। ঐরূপ ধারণা হওয়া অতি স্বাভাবিক। কিন্তু এমন এমন অনেকগুলি বিষয় জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, সাধারণ মানুষের ঐরূপ ধারণা ভুল।

নক্ষত্রপুঞ্জের মাঝে মাঝে আকাশের কয়েক স্থানে অপেক্ষাকৃত ছায়া ঘন দেখায়। শক্তিশালী দূরবীক্ষণ দিয়া ঐ সকল স্থান ভাল করিয়া বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, ঐ সকল স্থান ব্যাপিয়া কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ থাকায় ওপারের নক্ষত্রের আলো

ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড

হারকিউলিশ নক্ষত্র পুঞ্জ

১

ছয় মিনিট ফটোগ্রাফের প্লেট ঐদিকে খুলিয়া রাখিলে এই চিত্র উঠে।

২

পনর মিনিটে এইরূপ চিত্র পাওয়া যায়।

৩

সাড়ে সাঁইত্রিশ মিনিট পরে এইরূপ চিত্র দেখা দেয়।

৪

প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে প্লেটে এইরূপ চিত্র ফুটিয়া উঠে।

ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড
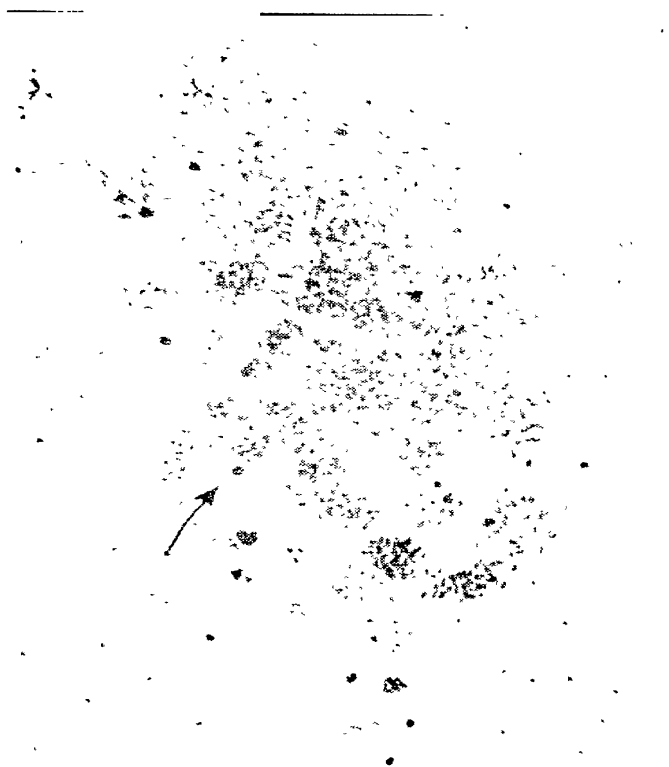
আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের একাংশের চিত্র

আমাদের সূর্য্য এই ব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য নক্ষত্রের মধ্যে একটি অতি সাধারণ নক্ষত্র মাত্র। দূর হইতে আমাদের সূর্য্যকে দেখিলে আকাশের পটে একটি ক্ষুদ্র আলোক বিন্দুর মত দেখাইবে। তীর চিহ্নিত আলোক বিন্দুটি এই চিত্রে সূর্য্য। আমাদের পৃথিবী ও সূর্য্যের অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহাদি এত ক্ষুদ্র যে দূর আকাশে অন্য নক্ষত্র হইতে ঐগুলি দেখিবার চেষ্টা করিলে চোখেই পড়িবে না।

উহা ভেদ করিয়া আমাদের নিকট আসিতে পায় না; সেইজন্য আকাশের ঐরূপ স্থান কৃষ্ণবর্ণ দেখায়।

কিন্তু এরূপ স্থান ব্যতীতও আকাশের বহু স্থানে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। আকাশের সকল স্থানেই যদি নক্ষত্রপুঞ্জ ছড়ান থাকিত, তাহা হইলে সারা আকাশেই উহাদিগের আভার ক্ষীণ রেশ ফুটিয়া উঠিত।

আকাশের অধিকাংশ স্থানেই ভাল করিয়া দেখিলে মহাশূন্য ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই আলোকহীন মহাশূন্যে একটা ক্ষীণ আলোর ধনু আকাশকে বেড়িয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ধনুর দু'টি মুখ আমাদের দিকচক্রবালের নিম্নে দক্ষিণ দিকে গিয়া মিলিয়াছে। মনে হয়, যেন আকাশ-বুড়ি রূপার উজ্জ্বল "বিছা" পরিয়াছেন। এই আলোর মালাকে "ছায়াপথ" বা আকাশগঙ্গা বলে।

এই ছায়াপথ সম্পর্কে জ্যোতিষীদিগেরও অদ্ভুত ধারণা ছিল। তাহার পর গ্যালিলিও তাঁহার নূতন দূরবীক্ষণটি দিয়া উহা দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন যে উহা অসংখ্য অস্পষ্ট নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোকে গঠিত। ছায়াপথ দেখিলে মনে হয় যেন কেহ ঘন কাল ভেলভেটের উপর চক্‌চকে রূপার দানা ছড়াইয়া দিয়াছে। দূরবীক্ষণে আর একটা জিনিষ ধরা পড়িল—ছায়াপথ আকাশের যে অংশ জুড়িয়া আছে উহারও অধিকাংশ শূন্য। এ যেন কৃষ্ণ পটভূমিকায় অসংখ্য তারার ফুল ফুটিয়া আছে।

২৩

ব্রহ্মাণ্ডচক্র

১২৫ বৎসর পূর্ব্বে স্যার উইলিয়াম্ হার্সেল (Sir William Herschel) সর্ব্ব প্রথম লক্ষ্য করেন যে সাধারণ চক্ষে নক্ষত্রগুলিকে বিশৃঙ্খল দেখিলেও উহারা বেশ একটা পরিকল্পনা অনুযায়ী সাজান আছে। একটি বিরাট রথচক্রানুসারে আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রগুলিকে সাজান চলে।

এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডচক্রের পরিধিটির নক্ষত্রগুলি মিলিয়া মহাকাশের ছায়াপথ গড়িয়াছে। এই নক্ষত্রগুলি কল্পনাতীত দূরে থাকায় এত নিষ্প্রভ দেখায়। একটা বিষয় তিনি ভুল করিয়াছিলেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত মতে আমাদের সূর্য্য ঐ ব্রহ্মাণ্ড-চক্রের নাভিদেশে (hub) অবস্থিত, তাঁহার এই সিদ্ধান্ত নির্ভুল নহে। আমাদের সূর্য্য ঐ বিরাট ব্রহ্মাণ্ডচক্রের নাভিদেশের নিকটেও নাই, আছে নাভি-চক্র হইতে দূরে উহার একটি অরের (spoke) উপর।

এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডচক্র মহাকাশে কুম্ভকারের চক্রের মত অবিরাম পাক খাইতেছে। ইহা সূর্য্যকে কেন্দ্রে রাখিয়া পাক খায় না; আমাদের পৃথিবী হইতে প্রায় ৫০,০০০ আলোক বৎসর দূরে উহার নাভিদেশ। এই সম্পর্কে আর একটি অতি অদ্ভুত বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহাকাশের গোলাকার নক্ষত্রপুঞ্জগুলির কেন্দ্রদেশ উক্ত নাভিদেশের দিকেই অবস্থিত এবং ঐ নক্ষত্রপুঞ্জগুলি কেন্দ্র হইতে প্রায় সমদূরেই অবস্থিত।

ঐ বিরাট ব্রহ্মাণ্ডচক্রের বেধ (thickness) আমাদের কল্পনাতীত। এই বেধে কোটি কোটি নক্ষত্রের স্থান আছে। ইহার পরিধি অসংখ্য নক্ষত্রে সজ্জিত। ইহার নাভিদেশও তদ্রূপ। ইহার প্রতি অরে সংখ্যাতীত নক্ষত্র অবিরাম জ্বলিতেছে।

এই ব্রহ্মাণ্ডচক্রের ফাঁকে ফাঁকে সংখ্যাতীত তারা কল্পনাতীত দূরে থাকায় উহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র উহাদিগের মিলিত আলো বিরাটের গর্ভকে অতি ম্লান আলোয় সামান্য মাত্র দৃষ্টিযোগ্য করিয়া তোলে।

নক্ষত্রের সংখ্যা

এই ব্রহ্মাণ্ডচক্রের নক্ষত্র গুণিতে পারা কি সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তর সহজ হইলেও বাস্তবে ব্যাপার দাঁড়ায় অন্যরূপ।

অমাবস্যা রাত্রে যন্ত্রের বিনা সাহায্যে নক্ষত্রগুলি গুণিলে পাঁচ সাত হাজারের বেশী চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্য লইলে বহু নক্ষত্রই চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে। অমাবস্যা রাত্রি অপেক্ষা চাঁদনী রাতে নক্ষত্রের

সংখ্যা আরও কমিয়া যায়। সাধারণ একটি অপেরা গ্লাস (opera glass) দিয়া দেখিলে অন্ততঃ এক লক্ষ নক্ষত্রের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। একটি আড়াই ইঞ্চি দূরবীক্ষণে দেখিলে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ নক্ষত্র দেখা দেয়। আমেরিকার ইয়ার্‌কি নগরীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৪০ ইঞ্চি দূরবীক্ষণে দেখা যায় দশ কোটিরও অধিক নক্ষত্র মহাকাশের বক্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যন্ত্রের দৃষ্টিশক্তি যতই বাড়াইতে পারা যায়, নক্ষত্রের সংখ্যা ততই বাড়িতে থাকে। বর্ত্তমানের বৃহত্তম দূরবীক্ষণের (১০০ ইঞ্চি) তীব্র দৃষ্টিতে অল্পাধিক দেড় শত কোটি নক্ষত্র ধরা পড়ে। ইহার অপেক্ষা বৃহৎ দূরবীক্ষণ (২০০ ইঞ্চি) একটি প্রস্তুত হইতেছে, উহার দৃষ্টিপথে কত যে অসংখ্য নূতন নূতন নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিবে তাহা গুণিয়া শেষ করিতে পারা যাইবে না। এই জন্য মহাকাশের নক্ষত্রগুলি গুণিয়া শেষ করিবার স্পর্দ্ধা না করাই ভাল।

নক্ষত্রচক্র আবিষ্কৃত হইবার পর হইতেই জ্যোতিষীদিগের নিকট এক মহা সমস্যা দেখা দিল। কি কারণে নক্ষত্রচক্রের নেমী প্রদেশের নক্ষত্রগুলি নাভি-কুণ্ডলের প্রবল আকর্ষণে গিয়া ঐ স্থানে জড় হয় না? নক্ষত্রচক্রের আকার বজায় থাকে কি করিয়া?

নক্ষত্র চক্রের নেমী প্রদেশ (rim) অবিরাম নাভিকুণ্ডলের (hub) চতুর্দ্দিকে পাক খাইতেছে বলিয়া উহার আকার ভাঙ্গিয়া পড়ে না। সৌরমণ্ডলের আকার ও গঠন লক্ষ্য করিলে এবিষয়ে আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। সৌর-মণ্ডলের গ্রহগুলি বেগে সূর্য্যকে অবিরাম প্রদক্ষিণ করে বলিয়াই সূর্য্যের প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণে উহারা সূর্য্যের বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়ে না। কোনও কারণে আজ যদি উহাদের চক্রাকার গতি থামিয়া যায়, তাহা হইলে উহারা সূর্য্যের প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণ ঠেকাইয়া রাখিতে না পারিয়া দ্রুত সূর্য্যগর্ভে গিয়া উপস্থিত হইবে।

কোন গ্রহের উপর সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ উহার দূরত্বের উপর নির্ভর করে। গ্রহ যত নিকটে থাকিবে উহার উপর সূর্য্যের প্রভাব তত বেশী হইবে। এই নিকটে থাকার জন্য অত্যধিক মাধ্যাকর্ষণ সামলাইতে গ্রহটিকে দ্রুততর বেগে

সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে হয়। গ্রহ সূর্য্যের যত নিকটে থাকে উহাকে উক্ত মাধ্যাকর্ষণ হইতে বাঁচিবার জন্য তত অধিক বেগে ছুটিতে হয়।

এই ব্যবস্থাই নক্ষত্র চক্রেও দেখিতে পাওয়া যায়। নক্ষত্রগুলি চক্রের নাভি-মণ্ডলের চতুর্দ্দিকে দ্রুতবেগে ছুটিতে থাকায় নাভিমণ্ডলে আসিয়া জড় হইতে পায় না। সৌরমণ্ডলের ব্যবহার মত নাভিমণ্ডলের নিকটস্থ নক্ষত্রগুলি দূরস্থ নক্ষত্রগুলি অপেক্ষা দ্রুততর বেগে উহাকে প্রদক্ষিণ করে।

আমাদের সূর্য্য ব্রহ্মাণ্ডচক্রের নাভিমণ্ডল হইতে বহু দূরে থাকায় প্রতি সেকেণ্ডে মাত্র দুই শত মাইল বেগে উহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এইরূপ বেগে ছুটিয়া নাভিমণ্ডলকে একবার মাত্র প্রদক্ষিণ করিতে বোধ হয় পঁচিশ ত্রিশ কোটি বৎসর লাগে। এই সংখ্যা সম্পূর্ণ আনুমানিক, কেন না আমরা এখনও জানি না নাভি-মণ্ডল হইতে কত দূরে আমাদের সূর্য্য আছে। নাভিমণ্ডলের দিক্‌জ্ঞান মাত্র আমাদের হইয়াছে, উহার স্থানজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা নাই বলিলেই হয়।

সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলির সূর্য্য-পরিক্রমা-বেগ জানিতে পারায় যেমন আমরা সূর্য্যের ওজন কষিয়া বাহির করিতে পারি, ঠিক সেইরূপ উপায়ে চক্রাকারে প্রদক্ষিণ রত কোন নক্ষত্রের বেগ জানিতে পারিলে নক্ষত্রগুলির ওজন জানা সহজ হইয়া পড়ে।

প্রতি নক্ষত্রটির উপর কেবলমাত্র নাভিমণ্ডলের মাধ্যাকর্ষণ অনুভূত হয় না, বিরাট ব্রহ্মাণ্ডচক্রের প্রতি পিণ্ডটির মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব উহার উপর পড়ে। ফলে আমরা ব্রহ্মাণ্ডচক্রের ওজন ইচ্ছা করিলে সঠিক বলিয়া দিতে পারি। অধিকাংশ নক্ষত্রের গড়ে ওজন প্রায় সূর্য্যের সমান তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সূর্য্যের ওজন আমরা জানি, অতএব সমষ্টির ওজনকে সূর্য্যের ওজন দিয়া ভাগ করিলে ব্রহ্মাণ্ডচক্রের নক্ষত্র সংখ্যা আমরা জানিতে পারি।

এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডচক্রের নক্ষত্র সংখ্যা প্রায় সঠিক পাওয়া যায়। এই সংখ্যা যে হাজার কোটি অপেক্ষা অধিক, সে বিষয়ে অতি দৃঢ়ভাবে বলা চলে। এই

সংখ্যা যদি কেহ গুণিতে আরম্ভ করিয়া প্রতি সেকেণ্ডে ২৫টি করিয়া গুণিতে থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডচক্রের নক্ষত্র সংখ্যা গুণিয়া শেষ করিতে ৭০০ বৎসর লাগিবে! অল্পায়ু মানবের একার পক্ষে এই গণনা শেষ করা অসম্ভব; বিশ পুরুষ ধরিয়া গণনা করিলে তবে ইহার একটা কিনারা হইতে পারে।

এইরূপ বিরাট ব্রহ্মাণ্ডচক্রের সংখ্যাতীত জ্বলন্ত পিণ্ডের মধ্যে আমাদের নাতি-বৃহৎ সূর্য্যের স্থান অতি নগণ্য বলিলেই হয়। তাহারই অঙ্গজাত কয়েকটি অতি ক্ষুদ্র পিণ্ডের মধ্যে আমাদের ধরিত্রী দেবী একটি। উক্ত বিরাটের তুলনায় ইহাকে একটি ধূলিকণাও বলা চলে না। মহাকাশের গর্ভে ভাসমান এই নগণ্য ধূলিকণাবাসী আমরা এমনই অন্ধ যে আমাদের জ্ঞানের "ব্যাঙের আধুলি" লইয়া রাত্রি দিন কলহ করি ও বড়াই করি।

২৪
অন্ধকারের অন্তরেতে

ব্রহ্মাণ্ড পিণ্ড

এক ব্রহ্মাণ্ডচক্রেই সৃষ্টি শেষ হয় নাই। মহাকাশের ছায়াপথ যে ব্রহ্মাণ্ড-চক্রের নেমী, সে ব্রহ্মাণ্ডচক্রের পারে—বহু দূরে— আরও বহু চক্রাকার নক্ষত্রপুঞ্জ দেখিতে পাওয়া যায়।

দূর হইতে দেখিলে কোন নগরীর দীপমালা হইতে নির্গত আলোকে আকাশ ম্লান জ্যোতিতে আলোকিত দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। পরে নিকটস্থ হইলে ঐ ক্ষীণ আভা তীব্ররূপে দেখা দেয়; এবং আরও নিকটে যাইলে নগরীর দীপগুলি উহাদের আলোকের তীব্রতানুযায়ী একে একে সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে।

ঠিক্ অনুরূপ ভাবেই মহাকাশের গভীরতম প্রদেশে লুক্কায়িত ব্রহ্মাণ্ডচক্রের নক্ষত্রগুলির সম্মিলিত আলো মহাকাশের এক কোণে একটা অস্পষ্ট ক্ষীণ আভারূপে

দেখা দেয়। যখন কোন শক্তিশালী দূরবীক্ষণ উহাকে আমাদিগের চক্ষের নিকটস্থ করে, তখন ঐ অন্ধকারের অন্তরেতে লুকান অস্পষ্ট আভার মধ্যে দূর কোন ব্রহ্মাণ্ডচক্রের নক্ষত্রগুলি স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠে।

দূর হইতে দেখিলে ঐরূপ ব্রহ্মাণ্ডচক্রকে মহাকাশের এক কোণে একটা ক্ষীণ আলোকের মেঘের মত দেখায়। এইরূপ জায়মান ব্রহ্মাণ্ডচক্রকে ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ড (nebula) বলা চলে ; কারণ সকল ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডই কিছু পরিষ্কার ব্রহ্মাণ্ডচক্রের রূপ গ্রহণ করে নাই। ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ড দুই প্রকারের দেখা যায়। প্রথম প্রকার ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ড রীতিমত কিম্বা প্রায় ব্রহ্মাণ্ডচক্রে পরিণত হইয়াছে।

প্রথম প্রকার ব্রহ্মাণ্ড পিণ্ড

প্রথম প্রকার ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ড আকাশপটে এক অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য। দেখিলে মনে হয়, যেন ঝড়ের মুখে ছিন্ন ভিন্ন ছুটন্ত একখানা বিরাট মেঘে আগুন লাগিয়াছে ; এইগুলি আমাদের ব্রহ্মাণ্ডচক্রের মধ্যেই ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। এইরূপ ধূমময় পরমাণুপুঞ্জ ব্রহ্মাণ্ডচক্রেরই অসংখ্য নক্ষত্র হইতে ছিট্‌কাইয়া বাহিরে আসা ধূলি ও জ্বলন্ত গ্যাসের মেঘ ব্যতীত কিছুই নহে। এইরূপ সাদা ও কাল মেঘ নক্ষত্র হইতে নক্ষত্রান্তরে আকাশ জুড়িয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ ধূমপুঞ্জ হইতে জগৎপিণ্ড কোনকালেই গড়িয়া উঠিবে না।

দ্বিতীয় প্রকার ব্রহ্মাণ্ড পিণ্ড

দ্বিতীয় প্রকারের ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডগুলি এক একটি রীতিমত ব্রহ্মাণ্ডচক্র ; কিন্তু মহাকাশের এমন দূরতম প্রদেশ আছে যে অতি শক্তিশালী দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলেও সাক্ষাৎ ভাবে উহাদিগের রূপ ধরা যায় না। এমন কি এত করিয়াও উহাদিগের ক্ষীণ আভাকে উজ্জ্বল করিতে পারা যায় না।

জ্যোতিষীগণ অন্য এক উপায়ে উহাদিগের প্রকৃত স্বরূপ ধরিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমন কি রাতের পর রাত ধরিয়া ফটোগ্রাফের অতি স্পর্শকাতর প্লেটের উপর যাহাতে ঐরূপ কোন ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ড হইতে আগত ক্ষীণ

আলো পড়ে তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে অস্পষ্ট আলোকের কুয়াশার মাঝে মাঝে ভিন্ন ভিন্ন আলোক বিন্দু ফুটিয়া উঠে। এই বিভিন্ন আলোক-উৎসগুলি নক্ষত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সুখের বিষয় এই সকল ব্রহ্মাণ্ডচক্রে এমন বহু নক্ষত্র থাকে যাহাদিগের আলোক শক্তি ধীরে ধীরে কমিয়া দ্রুত গতিতে পূর্ব্বের ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়া পায়। এইরূপ নক্ষত্র অসম্ভব উজ্জ্বল হওয়া সত্ত্বেও কল্পনাতীত দূরে থাকায় এমন ম্লান যে দেখিতেই পাওয়া যায় না। এইরূপ প্রায় অপরিমেয় দূরত্ব মাপিতে হইলে মাপকাঠিও সেইরূপ হওয়া প্রয়োজন। এই সকল ক্ষেত্রে আলোক-বৎসর (Light-year) দিয়া দূরত্ব মাপা হয়।

আমাদের পৃথিবীর নিকটতম ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডটী ৭৫০,০০০ আলোক-বৎসর দূরে অবস্থিত। তার পরেরটি ৮০০,০০০ আলোক-বৎসর দূরে আছে। অতি অদ্ভুত ব্যাপার! ঐ উৎস হইতে যে আলোক আজ আমার চক্ষে লাগিল, তাহা আট লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল। ঐ দূরতম উৎস হইতে আলোক তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া মহাকাশের নিবিড় অন্ধকারের অন্তরদেশ ভেদ করিয়া আট লক্ষ বৎসর ছুটিয়া আজ আমার চক্ষে প্রথম বাধা পাইল।

এমন বহু ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডের অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছে, দূরত্বের জন্য যাহাদিগের মধ্যস্থ কোন হ্রাসবৃদ্ধিশীল জ্যোতিসম্পন্ন (Cepheid Variables) তারকা ধরা পড়ে না। এরূপক্ষেত্রে অন্য উপায়ে উহাদিগের দূরত্ব মাপিতে হয়। সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী দূরবীক্ষণে এমন ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডের অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছে, যে-স্থান হইতে আলো আসিতে পঁচিশ কোটি বৎসর লাগে।

ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডের ওজন

আমাদের ব্রহ্মাণ্ডচক্র সৌরমণ্ডলের মত চেপ্টা এবং ইহারই মত আপন নাভিমণ্ডলকে অবিরাম বেগে প্রদক্ষিণ করিয়া আপন আকার বজায় রাখিতে পারিয়াছে। অধিকাংশ ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডই আকারে চেপ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব উহাদিগের ঐ চেপটা আকার বজায় রাখিতে নেমী প্রদেশের নক্ষত্রগুলি

আপন আপন নাভিমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে নিশ্চয় অবিরাম প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই প্রদক্ষিণ-গতিবেগ জানিতে পারিলে নাভিমণ্ডল অভিমুখে মাধ্যাকর্ষণের পরিমাণ বাহির করা সহজ। এইরূপে আনুমাণিক একটা হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডগুলির গড়ে ওজন প্রায় সমান।

ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডগুলির গড়ে ওজন সমান হইলেও উহাদিগের নক্ষত্র সংখ্যা এক হইবে তাহার কোনও কারণ নাই। বহু এমন ব্রহ্মাণ্ডচক্র পাওয়া গিয়াছে যাহাদিগের নেমী প্রদেশের নক্ষত্রগুলিকে নানা উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন করিতে পারিলেও কল্পনাতীত দূরত্বের জন্য উহাদিগের নাভিমণ্ডলের তারাগুলিকে কিছুতেই ভিন্ন করিতে পারা যায় নাই। উহাদিগের নাভিমণ্ডলকে ধূমময় জ্বলন্ত পরমাণুপুঞ্জ বলিয়া বোধ হয়। সম্ভবতঃ ঐরূপ ক্ষেত্রে ঐ জ্বলন্ত পরমাণুপুঞ্জ এখনও নাভিমণ্ডলের নক্ষত্ররাজি রূপে আকার গ্রহণ করিতে পারে নাই, অতি দূর ভবিষ্যতে করিতে পারে।

ব্রহ্মাণ্ডচক্রের ক্রমবিকাশ

মহাকাশের অন্তরতম প্রদেশের যতগুলি ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডের ফটো এ পর্য্যন্ত লইতে পারা গিয়াছে, সেগুলিকে যেটি যতখানি চেপ্‌টা সেই অনুসারে পাশে পাশে সাজাইলে, উহাদিগের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চেপ্‌টার ক্রমানুসারে ফুটিয়া উঠে। এ যেন আয়তন অনুযায়ী ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডগুলির একটি মালা গাঁথা। মালার এক মুখে বৃহত্তম ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ড এবং অন্য মুখে ক্ষুদ্রতমটি দিয়া আয়তন ক্রমানুসারে মালাটি গাঁথা।

আয়তন যেমন বাড়িতে থাকে, ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডগুলি তেমনি বর্ত্তুলাকার হইতে চেপ্টার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ণেরও একটা ক্রমপরিবর্ত্তনও ঘটিতে দেখা যায়। এককথায় আয়তন অনুযায়ী মালাটি গাঁথিলে আকার ও বর্ণানুযায়ী মালা আপনি গাঁথা হইয়া যায়। এই গাঁথা মালায় দেখা যায় সর্ব্বাপেক্ষা চেপ্টা ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। দুইটি

ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড

ব্রহ্মাণ্ড চক্রের ক্রম বিকাশ

সম্পূর্ণ বর্ত্তুলাকার ব্রহ্মাণ্ড পিণ্ড।

ক্রমশঃ বর্ত্তুলাকার ব্রহ্মাণ্ড
পিণ্ড ডিম্বাকার ধারণ
করিতেছে।

কালে উহা কতকটা
চেপ্টা আকার গ্রহণ করিতেছে।

ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড

এই চিত্রে উহা আরও
চেপ্টা হইয়াছে। উহার প্রান্তদেশ
চক্রের নেমির আকার গ্রহণ
করিতেছে।

চেপ্টা ব্রহ্মাণ্ড পিণ্ডে ক্রমশঃ
ফাট ধরিতেছে।

কালে চেপ্টা ব্রহ্মাণ্ড পিণ্ড
ভাঙ্গিয়া পড়িয়া নক্ষত্রের মেলা
ফুটিয়া উঠিতেছে।

ব্রহ্মাণ্ড পিণ্ডমালা হইতে কয়েকটি মাত্র পদের চিত্র উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া গেল। প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণ বর্তুলাকার ধূমময় ব্রহ্মাণ্ড পিণ্ডকে পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মাণ্ড চক্রাকার লাভ করিতে ঐ প্রকার বহু পদই অতিক্রম করিতে হয়। মহাকাশের কোণে কোণে ঐরূপ বহু পদেরই আলোক চিত্র গ্রহণ করিবার সুযোগ হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ড যদি একইরূপ চেপ্টা হয়, তাহা হইলে উহাদিগের আয়তনও এক হইবে।

নক্ষত্রের জন্ম

সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা একটু বিশদভাবে এইবার বলিব। ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ড-মালার একমুখে সম্পূর্ণ বর্ত্তুলাকার ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ড, কোনদিকেই সামান্য চাপা নহে। এইরূপ ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডে সহস্র চেষ্টা করিয়াও কোন নক্ষত্রের অস্তিত্ব ধরা পড়ে না। এইগুলি দেখিতে অনেকাংশে কদম্বের মত, ধূমময় পরমাণুপুঞ্জ মাত্র। ক্রমে মালাটি ধরিয়া অগ্রসর হইতে থাকিলে ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডগুলি ক্রমশঃ চেপ্টা হইতে দেখা যায়। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না চাকির মত সম্পূর্ণ চেপ্টা আকার গ্রহণ করে, ততক্ষণ এইগুলিতে নক্ষত্র ফুটিতে দেখা যায় না।

প্রথমে ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডের প্রান্তদেশে নক্ষত্রগুলি ফুটিয়া উঠে। তাহার পর ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডমালার চেপ্‌টাভাব যতই সম্পূর্ণ হইতে থাকে, ততই ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ড অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রখচিত পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডচক্রে পরিণত হইতে দেখা যায়। সর্ব্বশেষে ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডের ধূমময় নাভিমণ্ডল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জে পরিণত হইলে, ঐ ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ড সম্পূর্ণ কুম্ভকারের চাকের মত পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মাণ্ড চক্রে পরিণত হয়।

এই ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডমালা ধূমময় বর্ত্তুলাকার ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ড হইতে আরম্ভ হইয়া অসংখ্য নক্ষত্রময় ব্রহ্মাণ্ডচক্রে শেষ হইয়াছে। এই মালার এইরূপ বিকাশ দেখিয়া মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয় যে, ঐ মালার ক্রমানুসারে সাজানো আকারহীন ধূমময় পরমাণুপুঞ্জ হইতে এক একটি ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ড কালে ক্রমবিকশিত হইয়া অসংখ্য নক্ষত্রময় পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডচক্রে পরিণত হইবে।

পদার্থবিদ্যার (Physics) সিদ্ধান্ত মতে এইরূপ ক্রমবিকাশের সমর্থন পাওয়া যায়। তপ্ত ধূমময় পরমাণুপুঞ্জ বয়ঃবৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ শীতল হইতে থাকিলে কালে কালে কি প্রকার বিভিন্ন রূপ লইতে থাকে, উহার নিখুঁত আকার গণিত শাস্ত্রানুসারে কষিয়া আমরা বাহির করিতে পারি। এইরূপ

পরের পর অবস্থানুসারে কষিয়া যাইলে, তপ্ত ধূমময় পরমাণুপুঞ্জ পদে পদে যে বিভিন্ন আকার গ্রহণ করে ঐগুলির সহিত ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডমালার অন্তর্ভুক্ত ব্রহ্মাণ্ড-পিণ্ড হইতে ব্রহ্মাণ্ডচক্র পর্য্যন্ত অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়।

বিশাল মেঘ জমিয়া যেমন বিন্দু বিন্দু জলে পরিণত হয়, ঠিক সেইরূপ অপরিমেয় তপ্ত ধূমময় পরমাণুপুঞ্জ বিশাল বিন্দুস্বরূপ নক্ষত্রে পরিণত হয়। এই সিদ্ধান্ত মতে বুঝিতে পারা যায় মহাকাশে নক্ষত্রগুলি এক একটি ব্রহ্মাণ্ডচক্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে কেন।

এক একটি ব্রহ্মাণ্ডচক্রেই নক্ষত্রগুলি জন্মে, আয়ুষ্কাল ভোগ করে এবং লয় প্রাপ্ত হয়। মেঘ হইতে জমিয়া জলবিন্দুগুলির যেমন ভার প্রায় সমান হয়, ঠিক সেইরূপই নক্ষত্রগুলির গড়ে ভার সমান।

নক্ষত্রের ক্রম-বিকাশ

নক্ষত্রগুলির ওজন অনন্তকাল ধরিয়া একই থাকে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রতি নক্ষত্রেরই কতক পরমাণু লয়প্রাপ্ত হইয়া বিকীর্ণ তেজে পরিণত হয়, ফলে উহার ভার ক্রমশঃ কমিতে থাকে।

অধিকাংশ জ্যোতিষীদিগের মতে নক্ষত্র আদিতে যখন রূপ গ্রহণ করে তখন দেখিতে থাকে বৃহদাকার, কিন্তু ঘন নয়। নক্ষত্র-শিশুর প্রকৃতি মানব শিশুর ঠিক বিপরীত। মানব-শিশু জন্মের পর বয়োঃবৃদ্ধির সহিত কিছুকাল ধরিয়া ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে; নক্ষত্র শিশু কিন্তু বয়োঃবৃদ্ধির সহিত পলে পলে কমিতে থাকে।

এই সিদ্ধান্ত যদি নির্ভুল হয়, তাহা হইলে আমাদের সূর্য্য প্রতি সেকেণ্ডে চল্লিশ লক্ষ টন কমিয়া আকার ও দীপ্তিতে পূর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন হইতেছে। অতি দূর ভবিষ্যতে সূর্য্যের বার্দ্ধক্যে ইহা সঙ্কুচিত হইয়া একটি শ্বেতকায় বামনে পরিণত হইবে। তখন ইহা হইতে প্রাপ্ত আলোক ও তাপ পৃথিবীর জীবকুলের বাঁচিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে না, ফলে সকল জীবগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

এইরূপে দূর অতীতের দিকে চাহিলে দেখি যে আমাদের শিশু-সূর্য্য স্বল্প

ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড

পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দূরবীক্ষণ সাহায্যে গৃহীত আকাশের এক অতি ক্ষুদ্রাংশের আলোকচিত্র
অধিকাংশ আলোক-বিন্দুগুলিই এক একটী বিরাট ব্রহ্মাণ্ড পিণ্ড (Nebula) কল্পনাতীত দূরে
অবস্থিত। ঐ স্থান হইতে আলোক আসিতে প্রায় পাঁচ কোটী বৎসর লাগে। ঐরূপ
কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড বিরাটের গর্ভে নিহিত

ঘূর্ণমান ব্রহ্মাণ্ড পিণ্ড

আকাশ জুড়ি একটি নূতন ব্রহ্মাণ্ড চক্র গড়িতেছে। প্রায় এগার ঘণ্টা ধরিয়া ফটোগ্রাফের একটি অতি স্পর্শকাতর প্লেট মহাকাশের এই কোণে দূরবীক্ষণের সহিত জুড়িয়া রাখা হয়। পরে এই অত্যদ্ভুত ব্রহ্মাণ্ড পিণ্ডের অস্তিত্ব ফটোগ্রাফের প্লেটে ধরা পড়ে।

ঘন অতি বিপুলকায় একটি অত্যুজ্জ্বল গোলকরূপে জন্মগ্রহণ করিল। ইহারও অতীতে ইহার আকার দেখিয়া ইহাকে নক্ষত্র বলিয়া ধরা যায় না। ধূমময় উগ্র তপ্ত পরমাণুপুঞ্জের স্থানে স্থানে ঘন হইয়া পাক খাইতেছে মাত্র। এই যে চিত্রগুলি আঁকিলাম উহা যে মোটেই কাল্পনিক নহে, নির্ভুল সত্য; ব্রহ্মাণ্ড-পিণ্ডমালাই উহার প্রমাণ।

ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডের জন্ম

ইহারও অতীতে আমরা কল্পনার সাহায্যে উপস্থিত হইতে পারি। এইস্থানে আসিয়া দেখা যায় বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক আমাদিগের প্রাচীন ঋষিদিগের সহিত একমত।

প্রাচীন ঋষিরা ধ্যানে যাহা দেখিয়াছিলেন, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক মহাকাশের প্রতি ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডটি লক্ষ্য করিয়া যুক্তিস্রোতে ভাসিয়া সেইস্থানেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

প্রাচীন ও নবীন উভয়েই দেখিলেন যে এই বিরাট জটিল সৃষ্টির আদিতে অবস্থা ছিল একাকার। অনন্ত দেশ (space) ব্যাপী ঐ অশেষ একের মেলায় প্রোটনকে (গুরু পুরুষ পদার্থ বীজ) ঘিরিয়া একাধিক ইলেকট্রোনের (লঘু স্ত্রী পদার্থ বীজ) অবিরাম রাসলীলা চলিতেছিল। গতির সঙ্গে সঙ্গে কাল জন্মিল। তাহার পর গতি হইতে তেজ জন্মিল। তেজের প্রবাহে একের মেলা আরও মাতিয়া উঠিল। ফলে নানারূপে সেই একের দলের ভাঙ্গা গড়া চলিতে লাগিল। ক্রমশঃ এই ভাঙ্গা গড়ায় নানা পরমাণু জন্মগ্রহণ করিল।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আদিতে ছিল একাকার,—একের সাম্যাবস্থা। ক্রমশঃ বৈষম্য দেখা দেওয়ায় সৃষ্টির জন্য উন্মুখতা জন্মিল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি পদার্থ একের মেলা এই বৈষম্যের জন্য ঘুলাইয়া উঠিল এবং স্থানে স্থানে গুটাইয়া দল পাকাইয়া ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডগুলি জন্মিল। তাহার পরের ইতিহাস পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড

বিশ্বের সীমা

ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে এপর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে দাঁড়ায়—প্রথমতঃ আমাদের পৃথিবী সৌর পরিবারের নানা গ্রহ উপগ্রহাদির মধ্যে একটি।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের সৌর-পরিবার ব্রহ্মাণ্ডচক্রের (Galactic system) অসংখ্য নক্ষত্রের মধ্যে একটি।

তৃতীয়তঃ, আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডচক্র মহাকাশের গর্ভের অনন্ত কোটি জায়মান, জাত, ও মুমূর্ষু ব্রহ্মাণ্ডচক্রের মধ্যে একটি।

এই সকল ব্রহ্মাণ্ডচক্রের সমষ্টিকে আমরা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বলিব। এই কি সৃষ্টির শেষ ? না, এরূপ অসংখ্য বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড মহাকাশের এমন গভীরতম গর্ভে লুক্কায়িত আছে, যেখানে আমাদের দৃষ্টির পাল্লা কোনদিনই পৌঁছিতে পারিবে না; বা তথা হইতে আলোকরশ্মি ছুটিয়া আসিতে আসিতে ক্লান্ত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া পরমাণু-কণিকায় পরিণত হইয়া বিশ্ব-রেণু-(cosmic dust) রূপে বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িবে।

বিশ্বের বিস্তার

ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার সীমাহীন নহে, উহা এখনও আমাদের হিসাবের মধ্যে আনিতে পারা যায়। বৃত্তের পরিধি যেমন অন্তহীন হইলেও সীমাহীন নহে, ঠিক সেইরূপই নাকি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপ্তি অন্তহীন হইলেও অসীম নহে। তবে সসীম বিশ্বও ছত্রভঙ্গ হইয়া অসীমের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, সেই কথাই পরে বলিতেছি।

বিশ্বের ছত্রভঙ্গের কারণ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সূর্য্য অবিরাম তেজ বিকীরণ করিয়া ক্ষুদ্রাকার হইয়া পড়িতেছে। উহার উপাদান তেজে পরিণত হওয়ায় উহার আকার অল্পে অল্পে কমিতেছে। আকারে ক্ষুদ্রতর হওয়ায় উহার মাধ্যাকর্ষণও দিন দিন কমিতেছে। যে অনুশাসন বলে সে আপন মণ্ডলভুক্ত গ্রহ উপগ্রহাদিকে নিকটে ধরিয়া রাখিতে পারিত উহা ক্রমশঃ শিথিল হওয়ায় গ্রহ উপগ্রহাদিগুলি দিন দিন সূর্য্য হইতে দূরে পলাইতেছে। প্রাণস্বরূপ সূর্য্য হইতে দূরে মহাকাশে মৃত্যু-শীতল গর্ভে পলাইয়া গিয়া উহারা ধীরে ধীরে মৃত্যুকেই বরণ করিতেছে।

ঠিক এইরূপেই আমাদের ব্রহ্মাণ্ডচক্রের নাভিমণ্ডল কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় উহা আর নেমি-প্রদেশের তারকারাজিকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। ফলে ব্রহ্মাণ্ডচক্রের নেমি-প্রদেশের তারকারাজির চক্রের মায়া কাটাইয়া ক্রমশঃ মহাকাশের গহনতম প্রদেশের দিকে ছুটিয়া পলাইবার উন্মুখতা জন্মিতেছে।

মহাকাশের অন্তহীন গর্ভের অসংখ্য জায়মান, জাত ও মুমূর্ষু ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডগুলিও কি এইরূপে কালে ছত্রভঙ্গ হইয়া যে যেদিকে ইচ্ছা ছুটিয়া পলাইবার জন্য উন্মুখ হইতেছে না?

বিশ্বের বিস্তার ও আলোকের বেগ

কেন্দ্রীয় অনুশাসন যতই শিথিল হইতেছে, ততই মণ্ডলীয় সভ্যগুলির মণ্ডলের মায়া কাটাইয়া ছুটিয়া পলাইবার বেগ বাড়িতেছে। এপর্য্যন্ত যতগুলি ব্রহ্মাণ্ড-পিণ্ডের এইরূপে ছুটিয়া পলাইবার বেগ নিরূপিত হইয়াছে, উহাদিগের মধ্যে দ্রুততম বেগ পাওয়া গিয়াছে ঘণ্টায় নয় কোটী মাইল। কালে এই বেগ বাড়িতে বাড়িতে এমন দিন আসিতে পারে, যখন উহার ছুটিয়া পলাইবার বেগ আলোর ছুটিবার বেগ অপেক্ষা বেশী হইয়া পড়িবে। তখন উহা হইতে আলো আর আমাদের নিকট পৌছিতে পারিবে না, কারণ আলো যে বেগে ছুটে, নক্ষত্র বা ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডের তখন ছুটিয়া পলাইবার বেগ উহাপেক্ষাও বেশী

হওয়ায় ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার আলোর বিস্তার অপেক্ষা বেশী হইতে থাকিবে। ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার বেশী হওয়ায় আমরা আলো অপেক্ষাও অধিক বেগে ছুটিতে থাকিব, আলো তখন সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল বেগে ছুটিয়াও আমাদের ধরিতে পারিবে না। তখন আর দূর মহাকাশের ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ড বা নক্ষত্র চোখে পড়িবে না।

আমাদের দৃষ্টির পাল্লা

এপর্য্যন্ত ২৫ কোটী আলোক-বৎসরের মধ্যে বিশলক্ষ ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডের অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছে। প্রতি ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডের উপাদানে দশহাজার কোটী সূর্য্য জন্মিতে পারে। অধিকতর শক্তিশালী দূরবীক্ষণের পাল্লা আরও বাড়িলে আরও কত ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডের অস্তিত্ব ধরা পড়িবে তাহার ঠিকানা নাই।

২৬

নক্ষত্র পরিচয়

মহাকাশের উত্তরাংশে

ধ্রুবতারা (Polestar) অঞ্চল

পৃথিবী আপন অক্ষের চারিদিকে ২৪ ঘণ্টায় একবার পাক খায়। এই কল্পিত অক্ষটিকে উত্তরদিকে প্রসারিত করিলে মহাকাশের যে বিন্দুতে ছেদ করে, ঐ বিন্দুর নিকটেই ধ্রুবের স্থান। পৃথিবী পাক খায় বলিয়া আমরাও পৃথিবীর সহিত অবিরাম পাক খাইতেছি। কিন্তু আমরা দেখিতেছি—মহাকাশ পাক খাইতেছে। এই কারণে সারা নভোমণ্ডলের তারাগুলিকে ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীকে কেন্দ্রে রাখিয়া একবার সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করিতে দেখা যায়। ফটো-গ্রাফিক্ প্লেটে ইহা বড় চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠে।

পৃথিবীর অক্ষদণ্ড কিন্তু পাক খায় না, সেই জন্য অক্ষদণ্ডের উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত ধ্রুবতারার মহাকাশে কোন স্থান পরিবর্ত্তন চোখে পড়ে না। মহাকাশে—
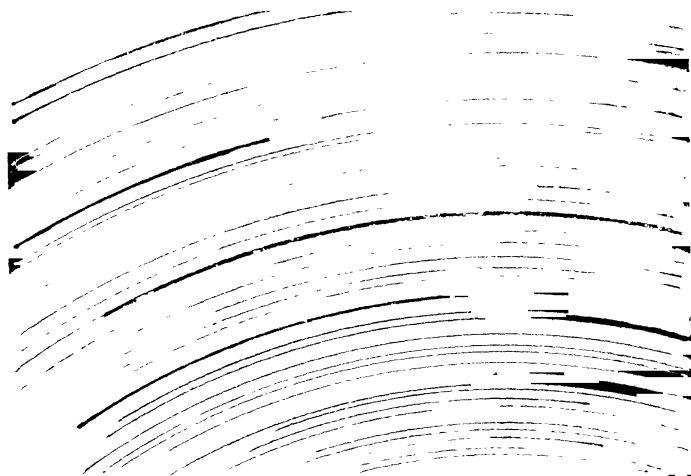
এক ধ্রুব নক্ষত্রটিই দৃশ্যতঃ অচল। এই কারণে রাত্রে এই নক্ষত্রটিকে দেখিয়া দিক্‌নির্ণয় করা চলে।

শিশুমার (Ursa minor) অঞ্চল

এই তারাদলের শেষ তারাটি ধ্রুব। এর দলে সাতটি তারা আছে। চারিটি তারা মিলিয়া একটি চতুষ্কোণ গড়িয়াছে, এবং ইহার এক কোণের সহিত পর পর আরও তিনটি তারা মিলিয়া উহার লাঙ্গুল গড়িয়া তুলিয়াছে। এই লাঙ্গুলের শেষ তারাটি ধ্রুব তারা। এই তারামণ্ডল হইতে ক্ষীণ আলো আসে।

সপ্তর্ষিমণ্ডল (Ursa major) অঞ্চল

ধ্রুব তারার কিছু নিকটেই আর একটি উজ্জ্বল তারামণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দেখিতে শিশুমারেরই মত, এবং ইহাতেও সাতটি তারা দেখিতে

পাওয়া যায়। এই নক্ষত্রগুলি বেশ উজ্জ্বল। ইহার চতুষ্কোণে যে চারিটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায় উহারা যথাক্রমে ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য ও অত্রি। পুলহ ও ক্রতু যোগ করিয়া যে সরল রেখাটি পাওয়া যায় উহাকে ক্রতুর দিকে বিস্তৃত করিলে উহা গিয়া ধ্রুবতে উপস্থিত হয়। অত্রির সহিত পর পর যথাক্রমে অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও মরীচি এই তিনটি তারা মিলিয়া এই তারামণ্ডলকে গড়িয়া তুলিয়াছে। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে চোখে পড়ে যে বশিষ্ঠের নিকটেই আর একটি অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল তারা আছে। এইটির নাম অরুন্ধতী। অরুন্ধতী বশিষ্ঠের চির-সহচরী।

কাশ্যপী (Cassiopoeia) অঞ্চল

ধ্রুবের যে দিকে সপ্তর্ষিমণ্ডল আছে, উহার বিপরীত দিকে একটি ইংরাজি 'W' আকারে নক্ষত্রমণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়। পাঁচটি নক্ষত্রে এই দলটি গঠিত। ইহার নাম কাশ্যপী। সপ্তর্ষিমণ্ডল ধ্রুব হইতে যত দূরে, প্রায় ঠিক ততখানি দূরে কাশ্যপীকে দেখিতে পাওয়া যায়।

কাশ্যপী অঞ্চলে একটি যুগ্ম তারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাশ্যপীর দক্ষিণ প্রান্তের তারাটিকে বিটা কাশ্যপী বলে, তাহার পরেরটি আলফা কাশ্যপী। বিটা ও আলফা যোগ করিয়া, ঐ রেখাকে আলফার দিকে, বিটা আলফার ব্যবধানের চারি গুণ বিস্তৃত করিলে, উহা ঐ যুগ্ম তারায় গিয়া উপস্থিত হয়। এই যুগ্ম তারা—গামা এ্যাণ্ড্রোমিডা (Gamma Andromida) নামে পরিচিত। ইহার উজ্জ্বলতর সহচরটি দেখিতে হরিদ্রাবর্ণ এবং অন্যটি নীলাভ সবুজ। ভাল দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে ঐ শেষোক্তটি একটি যুগ্মতারা বলিয়া ধরা পড়ে। এই যুগ্মতারার একটি অপরটিকে ৫৫ বৎসরে একবার প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় চারিশত আলোক-বৎসর।

ব্রহ্মহৃদয় (Capella) অঞ্চল

কালপুরুষ (Orion) ধ্রুব নক্ষত্রদ্বয়ের মধ্যে থাকায় ইহাকে বাহির করা

সহজ। সপ্তর্ষি মণ্ডলের চতুর্ভুজের দীর্ঘতম ভুজটির রেখায় থাকায় ইহাকে খুঁজিয়া পাওয়া তত শক্ত নহে। ইহার নিকটে ইংরাজী V অক্ষরের আকারে তিনটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মহৃদয় একটি যুগ্মতারা (Binary)। ইহাদের দূরত্ব প্রায় ৫৫ আলোক বৎসর। এই দুইটি তারা পীত অতিকায় নক্ষত্র শ্রেণী ভুক্ত।

হারকিউলিস্ (Hercules) অঞ্চল

জ্যৈষ্ঠ মাসের দিকে হারকিউলিস্ নক্ষত্রপুঞ্জ পূর্ব্বাকাশে উদয় হয়। এই অঞ্চলে বুটিশ (Bootes) ও ড্রাকো (Draco) নক্ষত্রপুঞ্জ দুটিকে দেখিতে পাওয়া যায়। বুটিশ ও হারকিউলিসের মাঝে সাত আটটি নক্ষত্র মিলিয়া ইংরাজি U অক্ষরের আকারে করোণা (Corona) নক্ষত্রপুঞ্জকে উদয় হইতে দেখা যায়। করোণার তারাগুলি ছোট ছোট, ইহাকে মুকুট বলিয়া ভ্রম হয়।

অভিজিৎ (Vega) অঞ্চল

মহাকাশের উত্তরাংশে এইটিই উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। ফলে উত্তর গোলার্দ্ধের সকল স্থান হইতে এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধের কতকাংশ হইতে ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বাহির করিবার একটি অতি সহজ উপায় বলি। সপ্তর্ষি মণ্ডলের চতুর্ভুজের পুলহ ও ক্রতুর সংযোজক বাহু বিস্তৃত করিলে যেমন ধ্রুব নক্ষত্রে গিয়া উপস্থিত হয়, ঠিক সেইরূপ পুলস্ত্য ও অত্রি সংযোজক বাহু বিস্তৃত করিলে অভিজিতে গিয়া উপস্থিত হইবে। ধ্রুব, অভিজিৎ ও স্বাতী (Arcturus) নক্ষত্রত্রয় যোগ করিলে একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ গড়িয়া উঠিবে। অভিজিতের রং ফিকা নীল। ইহার অবস্থা লুব্ধকের মত এবং ইহা লুব্ধকের দ্বিগুণ বা আমাদের সূর্য্যের পঞ্চাশ গুণ দীপ্তিশালী। ইহার দূরত্ব ছাব্বিশ আলোক-বৎসর।

মহাকাশের বিষুব অংশ

লুব্ধক অঞ্চল (Sirius Region)

ইহা বৃহৎ কুকুর মণ্ডলের (Canis Majoris) প্রধান নক্ষত্র। মহাকাশের এই অংশের মাঝে কালপুরুষ, উহার চারিদিকে ঘিরিয়া আছে ক্ষুদ্র কুকুর মণ্ডল (Canis Minor), বৃহৎ কুকুর মণ্ডল (Canis Majoris), বৃষ (Taurus —the Bull), শশক (Lepus —the Hare) ও ইউনিকরন্ (Unicorn—এক প্রকার কাল্পনিক একশৃঙ্গী পশু)। লুব্ধক দক্ষিণ গোলার্দ্ধের আকাশে অবস্থিত হইলেও ভূ-বিষুব মণ্ডলের অতি নিকটে থাকায় মেরু মণ্ডল ব্যতীত আর সকল স্থান হইতেই দৃষ্টিগোচর হয়। মহাকাশে ইহাপেক্ষা উজ্জ্বল নক্ষত্র আর একটিও নাই। ইহা দেখিতে নীলাভ।

কালপুরুষ অঞ্চল (Orion Region)

কালপুরুষ পূর্ব্বাকাশের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। কাছাকাছি সমান ব্যবধানে অবস্থিত তিনটি তারায় মিলিয়া কালপুরুষের কটিবন্ধ গড়িয়া তুলিয়াছে। এই কটিবন্ধের উপর-নীচে লম্বভাবে সমান দূরে আরও দুইটি তারা দেখিতে পাওয়া যায়। কটিবন্ধের বামদিকে একটি তারার মালা নামিয়াছে, ইহাই কালপুরুষের খড়্গ। কালপুরুষের বাম দিকের উজ্জ্বল তারাটির নাম আর্দ্রা (Betelgeux) ইহার রং লাল এবং দক্ষিণ (right) দিকের নক্ষত্রটি দেখিতে আরও বড়—নাম বাণরাজা (Rigel)। এই মণ্ডলে আর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়, উহার নাম কার্ত্তিকেয় (Bellatrix)। কালপুরুষের কটিবন্ধের বাম দিকে সামান্য দূরে মহাকাশে লুব্ধক লুব্ধ দৃষ্টিতে জ্বল জ্বল করিয়া চাহিয়া আছে।

জানুয়ারী মাসে—রাত্রি প্রায় দশটায় উত্তর গোলার্দ্ধ হইতে দেখিলে কালপুরুষকে দক্ষিণ আকাশে দেখিতে পাওয়া যাইবে। বাণ রাজার (Rigel)

আলোক-শক্তি সূর্য্যের ১৫,০০০ গুণ। আদ্রা নক্ষত্রের আলোক-শক্তি সূর্য্যের ১২০০ গুণ, কিন্তু ব্যাস সূর্য্যের তিনশত গুণ। আদ্রা—রক্তবর্ণ অতিকায় নক্ষত্র শ্রেণীভুক্ত। এই অঞ্চলে কালপুরুষের পূর্ব্বদিকে ক্ষুদ্র কুকুর মণ্ডল (Canis Minor) অবস্থিত। এই মণ্ডলের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটির নাম সরমা (Procyon)। কার্ত্তিকেয় ও আদ্রা নক্ষত্র দুইটি কালপুরুষ চতুষ্কোণের উপর দিকের ভুজ। এইটিকে বামদিকে প্রসারিত করিলে সরমায় গিয়া ঠেকিবে।

রাশিচক্র

আকাশে বহু তারকামণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বারটি পরস্পর হইতে সমান দূরে থাকিয়া পৃথিবীকে কেন্দ্রে রাখিয়া বৃত্তাকার পথে পূর্ব্ব পশ্চিমে অবিরাম ঘুরিতে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে ইহারা ঘুরে না ; পৃথিবী নিয়ত পাক খাওয়ায় ঐরূপ দেখায়। এই বৃত্তাকার পথকে ক্রান্তিবৃত্ত (Ecliptic) বলে। দৃশ্যতঃ সূর্য্যের গতিও এই পথে। এই বারটি সমান দূরে অবস্থিত তারকামণ্ডলকে বারটি রাশি বলে।

বৃত্ত মাত্রেরই পরিধিকে বারটি সমান অংশে ভাগ করিলে, প্রতি ভাগের দৈর্ঘ্য হয় $\frac{৩৬০}{১২}$ = ৩০ ডিগ্রি। তাহা হইলে প্রতি রাশির দৈর্ঘ্য মাত্র ৩০ ডিগ্রি। রাশিচক্রের কেন্দ্রে আমাদের পৃথিবীর স্থান।

এই বারটি রাশির নাম ক্রমানুসারে দেওয়া গেল :

১ মেষ Aries
২ বৃষ Taurus
৩ মিথুন Gemini
৪ কর্কট Cancer
৫ সিংহ Leo
৬ কন্যা Virgo
৭ তুলা Libra
৮ বৃশ্চিক Scorpio
৯ ধনু Sagittarius
১০ মকর Capricornus
১১ কুম্ভ Aquarius
১২ মীন Pisces

রাশি চক্রের তারকামণ্ডলগুলির অন্তর্গত ২৭টি পরিচিত নক্ষত্রের নাম দেওয়া গেল। এইগুলির প্রত্যেকটি পরস্পর হইতে সমান দূরে অবস্থিত। এই নক্ষত্রগুলি বহুক্ষেত্রে একাধিক তারকা লইয়া গঠিত দেখা যায়। ১২টি রাশির অধিকারে ২৭টি নক্ষত্র পড়ায়, প্রতি রাশির অধিকারে সওয়া দুইটি করিয়া নক্ষত্র পড়ে।

রাশি		নক্ষত্র
১ম	মেষ	অশ্বিনী, ভরণী, ১/৪ কৃত্তিকা
২য়	বৃষ	৩/৪ কৃ, রোহিণী, ১/২ মৃগশিরা
৩য়	মিথুন	১/২ মৃ, আদ্রা, ৩/৪ পুনর্বসু
৪র্থ	কর্কট	১/৪ পু, পুষ্যা, অশ্লেষা
৫ম	সিংহ	মঘা, পূর্ব্ব ফাল্গুনী, ১/৪ উত্তর ফাল্গুনী
৬ষ্ঠ	কন্যা	৩/৪ উঃ, হস্তা, ১/২ চিত্রা
৭ম	তুলা	১/২ চিঃ, স্বাতী, ৩/৪ বিশাখা
৮ম	বৃশ্চিক	১/৪ বিঃ, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা
৯ম	ধনু	মূলা, পূর্ব্বাষাড়া, ১/৪ উত্তরাষাড়া
১০ম	মকর	৩/৪ উঃ, শ্রবণা, ১/২ ধনিষ্ঠা
১১শ	কুম্ভ	১/২ ধঃ, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদা
১২শ	মীন	১/৪ পূঃ, উত্তরভাদ্রপদা, রেবতী

দৃশ্যতঃ সূর্য্যের গতিপথেই রাশিচক্র থাকায়, সূর্য্য বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া বার মাসে মেষ হইতে আরম্ভ করিয়া বারটি রাশি যথাক্রমে ভোগ করে। সূর্য্য বৈশাখ মাসে মেষ রাশিতে উদয় হয়, জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ রাশিতে, আষাঢ় মাসে মিথুন রাশিতে ইত্যাদি ক্রমানুসারে উদয় হইতে থাকে। চন্দ্র ২৭ দিনে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করায় প্রতিদিন এক একটি নক্ষত্র ভোগ করে।

পঞ্চম—সিংহ রাশি (Leo)

বৈশাখ মাসে ধ্রুবতারা এবং সপ্তর্ষিমণ্ডলের ক্রতু ও পুলহের রেখা ধরিয়া বরাবর মাথার উপরে মহাকাশের মাঝখানে চলিয়া আসিলে একটি তারামণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রতু হইতে ধ্রুব যতখানি দূরে, বিপরীত দিকে ঠিক ততদূরেই সিংহরাশি অবস্থিত। ইহার প্রধান অংশ দেখিতে অনেকটা একটি উপুড়-করা বাটির মত।

এই তারামণ্ডলের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটির নাম মঘা (Regulus)। ইহার রং লাল। এই রাশির সহিত সিংহের আকৃতির মিল থাকায় ইহার নাম সিংহরাশি। মাঘ মাসে সিংহরাশিকে পূর্ব্বাকাশে ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। মঘা এই সিংহের সম্মুখদিকে অবস্থিত, এবং ইহার লেজের শেষের দিকে একটি বড় নক্ষত্রকে জ্বল জ্বল করিতে দেখা যায়—ইহাই হইল উত্তরফাল্গুনী (Denebola)।

তৃতীয়—মিথুন রাশি (Gemini)

এই তারামণ্ডলে দুইটি উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে ; ক্যাষ্টর (Castor) ও পুনর্ব্বসু (Pollux)। ধ্রুবতারার সহিত সরমা (Procyon) যোগ করিলে যে সরল রেখা পাওয়া যায়, উহার উপরেই ঐ দুইটি নক্ষত্র অবস্থিত। এই নক্ষত্র চিনিবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়।

চতুর্থ—কর্কট রাশি (Cancer)

সিংহ ও মিথুন রাশির মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহাতে কোন উজ্জ্বল তারকা নাই। বিনা দূরবীক্ষণে দেখিলে একটা অস্পষ্ট আলোকে আলোকিত এক টুকরা সাদা স্থির মেঘের মত দেখায়। ইহা আকারে মৌচাকের মত বলিয়া জ্যোতিষীরা এই তারামণ্ডলকে মৌচাক (Praesepe) বলেন। সামান্য অপেরা-গ্লাস দিয়া দেখিলেই এই অস্পষ্ট সাদা মেঘের টুকরায় বহু নক্ষত্র ফুটিয়া উঠে। সিংহ রাশির নিম্নে অশ্লেষা নামে একটী নক্ষত্র দেখা যায়। এই নক্ষত্রটি কর্কট রাশির অন্তর্গত।

ষষ্ঠ—কন্যা রাশি (Virgo)

সিংহরাশির যে দিকে ও যতখানি দূরে কর্কট রাশিকে দেখিতে পাওয়া যায়, উহার বিপরীত দিকে ও ততখানি দূরেই কন্যারাশির স্থান। পাঁচটি তারায় মিলিয়া একটি বড় সমকোণের মত একটি কোণ গড়িয়া তুলিয়াছে। সপ্তর্ষি-মণ্ডলের ক্রতু ও পুলস্ত্য নক্ষত্র দুইটি যোগ করিয়া দিলে যে রেখাটি পাওয়া যায়, উহাকে একটু বাঁকাইয়া উক্ত সমকোণের দিকে বিস্তৃত করিলে কন্যারাশির অন্তর্গত চিত্রা (Spica) নামক উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটির দেখা মিলিবে।

সপ্তম—তুলারাশি (Libra)

কন্যার পরেই তুলারাশির স্থান। কন্যারাশির চারিটি ক্ষীণালোক তারায় মিলিয়া একটি চতুষ্কোণ গড়িয়াছে। এই চতুষ্কোণ হইতে দূরে স্বাতী নক্ষত্র জ্বলিতে দেখা যায়। ইহাও হিন্দু জ্যোতিষী মতে কন্যারাশির অন্তর্গত। সিংহ রাশির উত্তরফাল্গুনী (Denebola), কন্যারাশির চিত্রা (Spica), ও তুলারাশির স্বাতী (Arcturus) যোগ করিলে একটি প্রায় সমবাহু ত্রিভুজ দাঁড়াইবে।

দ্বিতীয়—বৃষ রাশি (Taurus)

কালপুরুষের কটিবন্ধের তিনটি তারার যোগরেখার উভয় দিকে কটিবন্ধের আটগুণ বিস্তৃত করিলে এক প্রান্তে থাকিবে লুব্ধক (Sirius) এবং অন্য দিকে থাকিবে একটি সুন্দর লাল রংএর তারা। এই লাল রংএর তারাটির নাম আলডিবারান্ (Aldebaran)। এই নক্ষত্রটি বৃষ রাশির অন্তর্গত প্রধান তারা। এই রাশির আর একটি নক্ষত্রও বেশ জ্বল জ্বল করে, ইহার নাম রোহিণী (Hyades)। বৃষরাশির পশ্চিম অংশে যে কয়েকটি তারা রহিয়াছে, উহারা কৃত্তিকা (Pleiades) বলিয়া পরিচিত। দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে কৃত্তিকা এক বিশাল নক্ষত্রপুঞ্জরূপে ফুটিয়া উঠে।

আলডিবারান্ (Aldebaran) মিথুন রাশির তৃতীয় নক্ষত্র (Gamma Geminiarum), সিংহ রাশির তৃতীয় নক্ষত্রটি (Gamma Leonis) ও উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্র প্রায় সমসূত্রে অবস্থিত।

অষ্টম—বৃশ্চিক রাশি (Scorpion)

তুলারাশির নীচের দিকে কাঁকড়া-বিছার লেজ বা ইংরাজি 'S' অক্ষরের মত একটি তারামণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাশিটি জ্যৈষ্ঠ হইতে ভাল দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাশির বহু নক্ষত্রের মধ্যে একটি উজ্জ্বল লাল রংএর নক্ষত্র দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহার নাম জ্যেষ্ঠা (Antares)।

নবম—ধনুরাশি (Sagittarius)

বৃশ্চিক রাশির পরেই ধনু রাশি। এই মণ্ডলে কোন বিশেষ উজ্জ্বল নক্ষত্র নাই। অনেকগুলি ছোট ছোট তারা এলোমেলোভাবে ছড়ান আছে মনে হয়।

দশম—মকর রাশি (Capricornus)

এই রাশিটির ধনুর পরেই স্থান। ইহাতেও বিশেষ কোন উজ্জ্বল তারকা নাই। হিন্দু জ্যোতিষীমতে শ্রবণা নক্ষত্র (Altair) এই রাশির অন্তর্গত। কিন্তু পাশ্চাত্য জ্যোতিষীমতে উহাকে বৃশ্চিকের উত্তরে স্থিত একুইলা-(Aquila, the Eagle) মণ্ডলের মধ্যে ধরা হয়।

একাদশ ও দ্বাদশ—যথাক্রমে কুম্ভ (Aquarius) ও মীনরাশি (Pisces)

এই দুই রাশিতেও বিশেষ কোন উজ্জ্বল তারকা নাই। কুম্ভের পূর্ব্বভাদ্রপদ (Markab), মীনের উত্তরভাদ্রপদ (Alpheratiz) ও গোপদ (Algenib)—এই তিনটি তারা তিন কোণে থাকিয়া পাশ্চাত্য জ্যোতিষী মতে পেগাসাস (Pegasus) নামে একটী তারামণ্ডল গড়িয়াছে। কুম্ভের উত্তরে পেগাসাসের স্থান।

প্রথম—মেশরাশি (Aries)

মীনরাশির উত্তর-পূর্ব্বদিকে রাশিচক্রের প্রথম রাশি মেষকে দেখিতে পাওয়া যায়। মীনের ও বৃষের প্রায় মধ্যস্থলে ইহার স্থান।
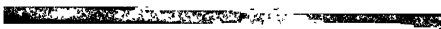
পরিশিষ্ট (ক)

দূরের তারকার দূরত্ব নিরূপণ

ভূমি (base) ও শীর্ষকোণের মাপ জানা থাকিলে ভূমি হইতে শীর্ষবিন্দুর দূরত্ব বাহির করা অতি সহজ। কিন্তু আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে এমন দীর্ঘ ভূমি পাওয়া সম্ভব নহে, যাহার দুই প্রান্ত-বিন্দু ঐ দূরস্থিত তারকার (শীর্ষ-বিন্দুর) সহিত যোগ করিয়া দিলে যে শীর্ষকোণ উৎপন্ন হয়, অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়াও তাহার পরিমাণ করা চলে।
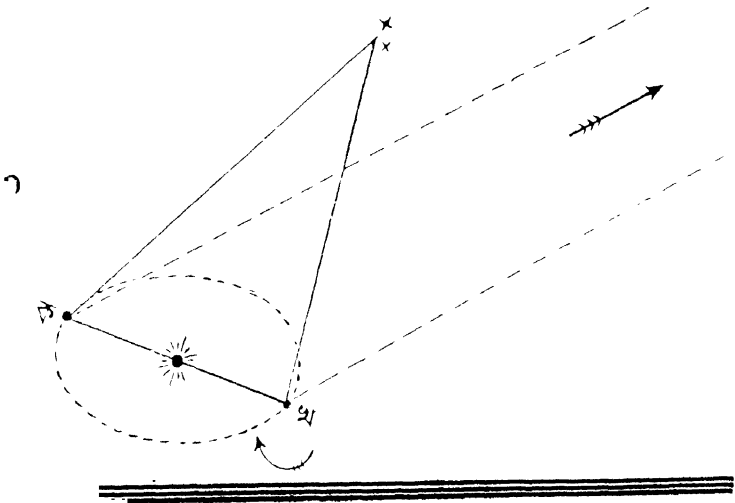
এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ এক কৌশল (Parallax) অবলম্বন করিয়াছেন। আমাদের পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার কালে উহার

প্রায় চক্রাকার কক্ষের ব্যাসের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে ছয়মাসে গিয়া উপস্থিত হয়। চিত্রে এই ব্যাস ক খ দিয়া দেখান হইয়াছে। মহাকাশে ক খ ১৮৬,০০০,০০০ মাইল দীর্ঘ। 'ক খ'কে ভূমি লইয়া X তারকার শীর্ষকোণ মাপিতে পারিলে পৃথিবী হইতে উহার দূরত্ব নিরূপণ করা সহজ।

চিত্রে ক ও খ পৃথিবীর কক্ষপথে ছয় মাস অন্তরের অবস্থান। তীর-চিহ্নিত সমান্তরাল রেখা দুইটি কোন এক অতি দূরের ক্ষীণালোক তারকা হইতে আগত আলোক রশ্মি। প্রায় অনন্ত দূর হইতে আগত বলিয়া রশ্মিদ্বয় সমান্তরাল। এই একটি রশ্মির সহিত Xক যোগ করিলে 'ক' তে একটি কোণ উৎপন্ন হয়। আবার ছয়মাস পরে ঐরূপে একটি রশ্মির সহিত Xখ যোগ করিয়া আর একটি কোণ উৎপন্ন হয়। এই দুইটি উৎপন্ন কোণের বিয়োগ ফল কXখ কোণের সমান। এইরূপে ছয় মাসে কখ ভূমির উপর দূরস্থিত X তারকা যে শীর্ষকোণ উৎপন্ন করে—তাহা পাওয়া গেল।

কখX ত্রিকোণের কখ ভূমির দৈর্ঘ্য ১৮৬,০০০,০০০ মাইল এবং উহার শীর্ষ কোণের পরিমাণ জানা গিয়াছে। অতএব পৃথিবী হইতে উহার দূরত্ব কX, বা খX কষিয়া বাহির করা সহজ।

পরিশিষ্ট (খ)

সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলি

গ্রহ	উপগ্রহের সংখ্যা	পৃথিবীর দূরত্বের তুলনায় সূর্য্য হইতে দূরত্ব	প্রদক্ষিণ কাল বৎসরে	গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে মাইলে	পৃথিবীর তুলনায় আকার		
					ব্যাস	আয়তন	ওজন
বুধ	০	০·৩৯	০·২৪	২৯·৭	০·৩৯	০·০৬	০·০৪
শুক্র	০	০·৭২	০·৬২	২১·৭	০·৯৭	০·৯২	০·৮১
পৃথিবী	১	১·০০	১·০০	১৮·৫	১·০০	১·০০	১·০০
মঙ্গল	২	১·৫২	১·৮৮	১৫·০	০·৫৩	০·১৫	০·১১
অণু-গ্রহপুঞ্জ	—	১·৪৬ হইতে ৫·৭১	১·৭৬ হইতে ১৩·৭	—	—	—	—
বৃহস্পতি	৯	৫·২০	১১·৮৬	৮·০	১০·৯৫	১৩১২	৩১৭
শনি	৯	৯·৫৪	২৯·৪৬	৬·১	৯·০২	৭৩৪	৯৫
উরেনাস	৪	১৯·১৯	৮৪·০১	৪·২	৪·০০	৬৪	১৪·৭
নেপচুন	১	৩০·০৭	১৬৪·৭৮	৩·৪	৩·৯২	৬০	১৭·২
প্লুটো	—	৩৯·৮	২৪৮	২·৯	সঠিক জানা নাই		

পরিশিষ্ট (গ)

কয়েকটি দৃশ্যতঃ উজ্জ্বল নক্ষত্র

তালিকার নাম	দূরত্ব আলোক বৎসরে	সূর্য্যের তুলনীয় ঔজ্জ্বল্য
লুব্ধক (Sirius)	৮.৬	২৬.৩
অগস্ত্য (Canopus)	সঠিক জানা	নাই
অভিজিৎ (Vega)	২৬	৫০
ব্রহ্মহৃদয় (Capella)	৫২	১৮৫
স্বাতী (Arcturus)	৪১	১০০
বাণরাজা (Rigel)	৫০০	১৫,০০০
সরমা (Procyon)	১০.৫	৫.৫
শ্রাবণা (Altair)	১৬	৯.২
কার্ত্তিকেয় (Betelgenx)	২০০	১২০০
পুনর্ব্বসু (Pollux)	৩২	২৮
চিত্রা (Spica)	২৩০	১৫০০
জ্যেষ্ঠা (Autares)	৩৮০	৪০০০
মঘা (Regulus)	৫৬	৭০

পরিশিষ্ট (ঘ)

কয়েকটি উপবৃত্তাকার পথে ভ্রাম্যমান ধূমকেতু

	নাম	প্রদক্ষিণকাল
১।	এন্‌কে (Encke)	৩'৩০৩ বৎসর
২।	দে ভিকো (De vico)	৬'৪০০ ঐ
৩।	ব্রোর্সেন (Brorsen)	৫'৪৫৬ ঐ
৪।	বেলা (Biela)	৬'৬৯২ ঐ
৫।	ফাই (Faye)	৭'৫৬৬ ঐ
৬।	টাট্‌টল্‌ (Tuttle)	১৩'৬৬৭ ঐ
৭।	পন্‌স্‌-ব্রুক্‌স্‌ (Pons-Brooks)	৭১'৫৬০ ঐ
৮।	ওল্‌বার্স (Olbers)	৭২'৬৫ ঐ
৯।	হেলি (Halley)	৭৬'০৮ ঐ
১০।	ফিন্‌লে (Finlay)	৬'৫৫৬ ঐ